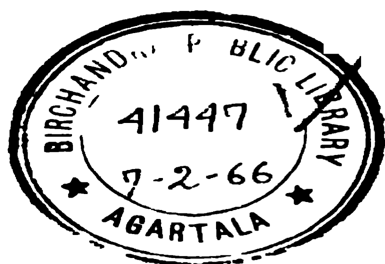
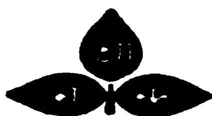
অমাবস্যার গান

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়





আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা ৯

প্রকাশক : শ্রীঅশোককুমার সরকার
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৫ চিন্তামণি দাস লেন
কলিকাতা ৯

মুদ্রক : শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
৫ চিন্তামণি দাস লেন ·
কলিকাতা ৯

প্রচ্ছদ : শচীন বিশ্বাস

প্রথম সংস্করণ : জুন, ১৯৫৫

মূল্য : ৩·০০ টাকা

শ্রীযুক্ত সাগরময় ঘোষ
বন্ধুবরেষু

অমাবস্যার
গান

পুরী থেকে বৈষ্ণবের দল চলেছে বৃন্দাবনের পথে। মহাপ্রভুর নির্বাণ তীর্থ থেকে রাধাকৃষ্ণের লীলাভূমি ব্রজধামে। সাক্ষীগোপালকে প্রণাম করে, বগীঁর অধিকারের সীমা পার হয়ে, কুলীন গ্রামের পরম ভক্ত মালাধর বসুর অঙ্গনে সংকীর্তন করে, খানাকুল-কৃষ্ণনগরে।

সারাদিনে অনেকখানি পথ পার হয়েছেন বৈষ্ণবেরা। সন্ধ্যার মুখে যখন খানাকুলে পৌঁছুলেন, তখন পা আর কারো চলতে চায় না।

'জয় গৌরাঙ্গ! আজ এখানেই বিশ্রাম নিতে হবে।'

দলের নেতা বৃদ্ধ বৈষ্ণব যে জায়গাটিতে এসে দাঁড়ালেন, সেটি মনোরম। সামনে দীঘির জলে সূর্যাস্তের রঙ। বসন্তের হাওয়ায় চার পাশের গাছপালায় মাতন জেগেছে। কোকিল ডাকছে, বাতাসে নিম-মঞ্জরীর গন্ধ।

দলের নেতা মোহান্ত আবার বললেন, 'নিমফুলের গন্ধ আসছে। এই নিম্ব বৃক্ষের মূলেই তো আবির্ভাব হয়েছিল মহাপ্রভুর।'—উদ্দেশ্যে হাত জোড় করে প্রণাম করলেন, তারপর বললেন, 'রাতটা এই দীঘির পাড়েই চমৎকার কেটে যাবে। আজ শুক্লপক্ষ, চাঁদ উঠবে একটু পরেই। আকাশে মেঘ-বৃষ্টিরও কোনো চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না। এসো, বসে পড়ো সবাই।'

সবাই বসে পড়ল ঠিকই আর নিমফুলের গন্ধে মেশানো বসন্তের হাওয়াও নেহাৎ মন্দ লাগছিল না। কিন্তু জনকয়েক একটু পরেই উসখুস করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত একজন আর থাকতে না পেরে বললে, 'প্রভু!'

মোহান্ত গুনগুন করছিলেন, 'জয় নিত্যানন্দ, জয় শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র'—তাঁর ঘোর লেগেছিল। বাধা পেয়ে ফিরে তাকালেন। বললেন, 'আবার কী হল?'

'পথ চলে সবাই ক্লান্ত, খিদে-তেষ্টাও পেয়েছে—'

মোহান্ত বাবাজী বললেন, 'সঙ্গে চিঁড়ে-মুড়কী আছে, সামনে টলটলে স্নিগ্ধ জল রয়েছে—শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় কিছুরই অপ্রতুল নেই। বেশ তো, সেবাটা সেরেই নেওয়া যাক না।'

বৈষ্ণবটি বয়সে ছেলেমানুষ, খিদেটাও একটু বেশি। করজোড়ে বললে, 'প্রভু, চিঁড়ে-মুড়ি যা আছে তা সামান্যই। তাতে কারো ভালো করে পেট ভরবে না।'

অক্রোধী মোহান্তও একটু বিরক্ত হলেন। একটা খঞ্জনী তুলে নিয়ে বার কয়েক ঝঙ্কার দিয়ে বললেন, 'পেটপুজো তো আর আসল কথা নয়—আমরা শ্রীবৃন্দাবনে তীর্থ করতে চলেছি। এ-টুকু আত্মনিগ্রহও যদি করতে পারবে না, তা হলে এ পথে এলে কেন?'

ছেলেমানুষ বৈষ্ণবটি মাথা নিচু করে বসে রইল।

মোহান্ত আবার বললেন, 'প্রভুপাদ শ্রীসনাতন গোস্বামী যখন রাজপদ ছেড়ে দীনাতিদীন হয়ে নীলাচলে গিয়েছিলেন, মনে আছে তাঁর সেই কৃচ্ছ্রসাধন? আধখানা হরিতকী সঞ্চয় রেখেছিলেন বলে সঙ্গের ভৃত্যটিকে পর্যন্ত তাড়িয়ে দিলেন।'

একটু দূরে ঘাসের ওপর পুঁটলি মাথায় দিয়ে দাড়িগোঁফওলা একজন বৈষ্ণব চিৎ হয়ে শুয়েছিলেন, আকাশের তারা গুণছিলেন খুব সম্ভব। তাঁর পাশেই মাঝবয়েসী রোগা চেহারার একটি লোক বসে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছিল মোহান্তকে। বেশ বোঝা যাচ্ছিল, মোহান্তের বাণী তার আদৌ পছন্দ হচ্ছে না। লোকটি লম্বমান শ্মশ্রুল গোসাঁইটির ব্যক্তিগত ভৃত্য, গৌরবে খাস শিষ্য।

সে গোসাঁইকে আস্তে একটা খোঁচা দিয়ে বললে, 'কর্তা, শুনছেন?'

গোসাঁই ভ্রূকুটি করে বললেন, 'আবার কর্তা? তোকে লক্ষবার বলিনি, আমি বৈষ্ণব সন্ন্যাসী? হয় প্রভু বলবি নইলে গোসাঁইজী বলবি।'

'এজ্ঞে, মনে থাকে না। আপনি না হয় হঠাৎ গোসাঁই হতে পারেন, কিন্তু আমার এতদিনের অভ্যাসটা চট করে যায় কেমন করে? তা ছাড়া চৌদ্দপুরুষ যার শাক্ত—তার এখন মালসাভোগ আর নামকেত্তন—'

'চোপ্'—বলে দাড়িওয়ালা গোসাঁই পাশ ফিরলেন।

'ইদিকে কণ্ঠী ধরেছ, ওদিকে শাক্তের বদমেজাজটি তো যায়নি।'

'আমাকে এখন জ্বালাসনি রঘু, শরীর ভালো নেই।'

'শরীর ভালো না থাকার এখুনি হয়েছে কি! ওদিকে মোহান্ত বাবাজীর ফতোয়া শুনছেন না? রাত্তিরের জন্যে হর্তুকীর ব্যবস্থা হচ্ছে যে!'

গোসাঁই হাসলেন এবার। বললেন, 'ক্ষতি কী! হর্তুকীর মতো উৎকৃষ্ট জিনিস কি কিছু আছে? কবিরাজী শাস্ত্রে কী বলে তা জানিস? কদাচিৎ কুপিতা মাতা—ন কুপিতা হরিতকী—'

রঘু অর্থাৎ রঘুনাথ এবার চটে উঠল। বললে, 'থামুন কর্তা থামুন।'

'আবার কর্তা?'

'হ্যাঁ, একশোবার কর্তা। জানি আপনি মস্ত পণ্ডিত, ফার্সী-সংস্কেত সব পড়ে ফেলেছেন, তাই বলে নাপিতের বাচ্চা রঘুকে এত সহজে ফাঁকি দিতে পারবেন না। খালি পেটে হর্তুকী? ভেবেছেন কী?'

দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে গোসাঁই বললেন, 'তোকে তো হাজারবার

বলেছি রঘু, তুই আমার সঙ্গে থেকে কষ্ট পাসনি, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যা। বৈরাগ-যোগ ভারী শক্ত জিনিস রে—সবাই কি আর পারে?'

'আপনি পেরেছেন বুঝি?'

'চোপরাও। তোর তো বড্ড মুখ বেড়েছে।'

'আহা, কী আমার বোষ্টুম রে! যেন মা-কালীর মতো খাঁড়া উঁচিয়েই রয়েছেন!'

গোসাঁই এবার উঠে বসলেন। পরম রূপবান দীর্ঘদেহ পুরুষ—বয়েস যৌবনের শেষ সীমায়, চল্লিশ ধরো-ধরো। একটু দূরেই জনকয়েক বৈষ্ণব পাটকাঠির একটা মশাল জ্বালছিলেন চকমকি ঠুকে, তার আলোয় জ্বলে উঠল তাঁর প্রতিভায় উজ্জ্বল চওড়া কপাল, বুদ্ধি আর কৌতুকে ভরা দুটি ঝকঝকে চোখ।

'তরোরিব সহিষ্ণুণা' আর 'অক্রোধেন ক্রোধং জয়েৎ'—এই সব বৈষ্ণবের আচরণীয় মহামন্ত্র ভুলে গিয়ে গোসাঁই একটা চড়ই বোধহয় তুলতে যাচ্ছিলেন রঘুর উদ্দেশে। কিন্তু ওই পর্যন্ত এগিয়েই ব্যাপারটা থেমে গেল, কারণ ঠিক সেই সময়েই মোহান্ত ডাকলেন : 'বাবাজী কৃষ্ণপ্রেম!'

রঘুর একটা ফাঁড়া কেটে গেল। গোসাঁই—অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রেম করজোড়ে বললেন, 'আজ্ঞা করুন প্রভু!'

'সবাই ভারী শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে আছে, তোমার মধুমাখা কণ্ঠে একখানা গান শোনাও।'

রঘু ফিস্‌ফিস্‌ করে বললে, 'হ্যাঁ, ভালো করে গান শোনান—জোড়া হর্তুকী প্রসাদ পাবেন।'

কৃষ্ণপ্রেম রঘুর দিকে একটা বজ্রদৃষ্টি ফেলে, কোমল গলায় বললেন, 'কী গাইব প্রভু? মহাজন-পদাবলী?'

'না—না, তোমার নিজের তৈরি গান। আশ্চর্য কবিত্ব হে তোমার, যেন সরস্বতীর বরপুত্র হয়েই জন্মেছ।'

'আজ্ঞে আমি কিছুই নই। সবই মহাপ্রভুর করুণা।'

'এই তো বৈষ্ণবের বিনয়।'—মোহান্ত প্রসন্ন হলেন : 'নাও, ধরো।'

কিছুক্ষণ চোখ বুজে থেকে দরাজ গলায় কৃষ্ণপ্রেম গান ধরলেন :

"জয় কৃষ্ণকেশব রাম রাঘব
কংসদানব ঘাতন।
জয় পদ্মলোচন নন্দনন্দন
কুঞ্জকানন রঞ্জন।
জয় কেশিমর্দন কৈটভার্দন
গোপিকাগণ মোহন।—"

'আহা, মধু—মধু।'—মোহান্তের উচ্ছ্বাস শোনা গেল।

মধুই বটে। যেমন দরাজ গলা, তেমনি আবেগ। বৈষ্ণবেরা স্থির হয়ে বসলেন সবাই। চাঁদ উঠল নিমগাছের মাথার ওপর, দীঘির জলে জ্যোৎস্না দুলতে লাগল, পাপিয়ার ডাক উঠল। কৃষ্ণপ্রেম গেয়ে চললেন :

"জয় গোপবল্লভ ভক্তসল্লভ
দেবদুর্লভ বন্দন।
জয় বেণুবাদক কুঞ্জনাটক
পদ্মনন্দক মণ্ডন—"

গানের টানে পথের লোকও জড়ো হতে লাগল দু-চার জন। তারপর ছোটখাটো একটি ভিড় এসে জমা হল বৈষ্ণবদের চারদিকে।

গান থামল। মোহান্তের চোখ দিয়ে নামল প্রেমাশ্রু। একটু আগেই যে ছেলেমানুষ বৈষ্ণবটি রাতের চিঁড়ে-মুড়ি নিয়ে ভাবনায় পড়েছিল, সে পর্যন্ত মগ্ন হয়ে বসে রইল।

ঘোরটা একটু কাটলে, গলায় চাদর জড়ানো, রসকলি কাটা একজন গোলগাল মাঝবয়েসী মানুষ এসে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন মোহান্তের পায়ে। জিজ্ঞেস করলেন, 'প্রভুরা কোত্থেকে আসছেন?'

'নীলাচল।'

'কত দূর যাওয়া হবে?'

'শ্রীধাম বৃন্দাবন।'

'শ্রীবৃন্দাবন—আহা। কত পুণ্য থাকলে মানুষের ব্রজধাম দর্শন হয়—রাধাগোবিন্দের পদরেণু দেহে মেখে জীবন ধন্য হয়ে যায়! আমরাই সংসারের বিষয়কীট—জাল কেটে আর বেরুতে পারি না।'

মোহান্ত জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কে?'

'আমি এখানকার বৈষ্ণব চূড়ামণি জমিদারবাবুদের নায়েব, অধমের নাম হরিদাস। কিন্তু নামেই হরিদাস, মহাভক্ত প্রভুপাদ যবন হরিদাসের নখকণারও যোগ্য নই। কিন্তু ঠাকুর, আমি একটি নিবেদন নিয়ে এসেছি আপনাদের কাছে। দয়া করে বিমুখ করবেন না।'

মোহান্ত বললেন, 'আহা, অত কুণ্ঠা কেন, বলুন না।'

'আজ বাবুদের শ্রীশ্রীগোপীনাথজীর মন্দিরে বিশেষ সংকীর্তনের ব্যবস্থা হয়েছে। কাটোয়া নবদ্বীপের বিখ্যাত সব কীর্তনীয়া এসেছেন—মাথুর পালা-কীর্তন হবে। দয়া করে আপনারা যদি সেখানে পায়ের ধুলো দেন, তবে আমরা বড়োই সুখী হবো। বৈষ্ণব-সেবারও সাধ্যমতো আয়োজন হয়েছে—প্রশস্ত নাটমন্দির আর অতিথিশালা আছে, আপনাদের রাত্রিবাসেও কোনো অসুবিধে হবে না।'

বৈষ্ণবদের মধ্যে একটা চাপা আনন্দের ঢেউ উঠল। দীঘির ধারে যতই চাঁদের আলো আর নিম-মঞ্জরীর গন্ধ থাক, ক্ষিদেয় তেষ্টায় সবাই আকুল হয়ে উঠেছিলেন। কাল সকালে উঠেই আবার সামনের দীর্ঘ পথে পা বাড়াতে হবে। রাতে একটুখানি পেট ভরে খাওয়া আর খানিক নিশ্চিন্ত বিশ্রাম মনে মনে কামনা করছিলেন সবাই। এমনকি প্রবীণ মোহান্তও যে প্রসন্ন হলেন না, তা নয়। ছেলেমানুষ বৈষ্ণবটি আর থাকতে পারল না, বলেই ফেলল, 'এ তো অতি সৎ প্রস্তাব।'

অক্রোধী মোহান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও একটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হানলেন তার দিকে। তারপর শান্ত স্বরে বললেন, 'যাব বই কি, নিশ্চয় যাব। যেখানে সংকীর্তন, বৈষ্ণব তো রবাহূত হয়েই সেখানে যায়। চলুন।'

হরিদাস হাতজোড় করে বললে, 'তা হলে আসুন আমার সঙ্গে—দয়া করে গা তুলুন আপনারা।'

বেশি বলবার দরকার ছিল না। নতুন উৎসাহে গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন বৈষ্ণবেরা। আর রঘু কৃষ্ণপ্রেমের কানে কানে বললে, 'আপনার গানের গুণ আছে কর্তা! হর্তুকীর হাত থেকে বাঁচিয়ে দিলেন!'

কৃষ্ণপ্রেম চাপা গলায় বললেন, 'এবার তোকে আমি নির্ঘাৎ তাড়িয়ে দেব।'

'আহা, চটেন কেন? বৈষ্ণবের রাগ করতে নেই।'

রাগের মাথায় কৃষ্ণপ্রেমের গলা দিয়ে বেরিয়ে গেল : 'জালিম! বরাখুরদার! বেকোয়াশ বাত্ ছোড় দো, নেহি তো—'

'ছি-ছি কর্তা! কৃষ্ণপ্রেম বাবাজী হয়ে আরবী-ফারসী কপচাচ্ছেন! লোকে বলবে কি!'

'তুই চুলোয় যা!' —কৃষ্ণপ্রেম একটু পিছিয়ে পড়েছিলেন, হন হন করে রঘুকে ফেলেই সামনের দিকে এগিয়ে চলে গেলেন।

আর সেই সময় একটা কথা মনে পড়ে গেল রঘুনাথের। বিদ্যুতের মতো চমকে গেল মাথার ভেতর। সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের লোকজন যারা আসছিল, সে ফিরে তাকালো তাদের দিকে।

'এ তো খানাকুল কৃষ্ণনগর, তাই নয়?'

দু তিন জন হেসে উঠল। বললে, 'খানাকুল কৃষ্ণনগর বইকি। গাঁয়ের নামটাও এতক্ষণে জানা হয়নি গোসাঁই?'

রঘুনাথ রাগ করে বললে, 'আমাকে গোসাঁই-টোসাঁই বলবেন না—ও-সব আমার কর্তাটিকে বলুন। আচ্ছা, এই গাঁয়েই তো মুকুন্দ ভট্চাযের বাড়ি?'

'হাঁ, এই গাঁয়েই। দীঘির পুব দিকেই তো বাড়িটা—সামনে মস্ত একটা জামগাছ রয়েছে। কিন্তু তারা তো বৈষ্ণব নয়। বাবাজীর সেখানে কী দরকার?'

'বৈষ্ণব না হলেই কি চেনা মানুষের খবর নিতে নেই? আপনারা তো বেশ লোক মশাই। আচ্ছা, আপনারা এগোন—আমি একটু ঘুরে আসছি।'

লোকগুলোকে একটা কথাও আর বলবার সুযোগ না দিয়ে রঘুনাথ জোর পায়ে ভট্‌চায বাড়ির দিকে এগিয়ে চলল। কর্তার এই পাগলামি আর সহ্য হয় না—তার অরুচি ধরে গেছে। একটা হেস্তনেস্ত যেভাবে হোক করা দরকার। আজ ভগবানই বোধহয় সে সুযোগ মিলিয়ে দিয়েছেন!

কর্তা যদি সত্যি সত্যিই মনেপ্রাণে গোসাঁই হয়ে যেতেন রঘুনাথের আপত্তি ছিল না; তা হলে সে-ও না হয় সাধ্যমতো বাবাজী হতে চেষ্টা করত, তিলক-সেবা করত, সংকীর্তন গাইত, আখড়ায় আখড়ায় প্রসাদ পেতো। এ তো সে নয়। এমন একটা মানুষ কেবল খেয়ালের ঝোঁকে হিল্লী দিল্লী ঘুরে বেড়াবে, রাজার ছেলে হয়ে মাটিতে শুয়ে থাকবে আর হর্তুকী খেয়ে রাত কাটাবে—রঘুনাথ কিছুতেই এতখানি বরদাস্ত করতে রাজী নয়।

আঠারো বছর বৈষ্ণবদের সঙ্গে থেকেও এ দুঃখ রঘুনাথের যায়নি; মরলেও যাবে না।

কতদিন বলেছে, 'কর্তা, বর্ধমান এতদিন আপনাকে ভুলে গেছে, এবার ভালো ছেলে হয়ে ঘরে ফিরে চলুন।'

'আমার ঘর নেই।'

'ঘর নেই?'—রঘুনাথ ব্যাজার হয়ে বলেছে, 'কেন বার-বার ও অলক্ষুণে কথা মুখে আনেন বলুন তো? বাপ-মা-ভাই—'

'কেউ না—কিছুই না। সন্ন্যাসীর পূর্বাশ্রম থাকতে নেই।'

'বাজে বকবেন না। ও-সব আশ্রম-ফাশ্রম আমার মাথায় ঢোকে না। আর যদি মনে মনে এ-সব মতলবই ছিল, তা হলে দুম করে একটা বিয়েই বা করে বসলেন কেন? আহা—মা-লক্ষ্মীর ভগবতীর মতো রূপ—'

'চোপ্‌!'

'আমাকে থামিয়ে দিলে কী হবে? ভগবান দেখছেন না? সাধু সেজে এ-সব অধর্ম করলে ভালো হবে আপনার? কী কুক্ষণেই যে আপনি বাবাজীদের পাল্লায় পড়লেন—'

'চলে যা আমার সামনে থেকে। তোর আমি মুখ-দর্শন করব না আর।'

'না-ই করলেন। সেই যে-সব বোষ্টুম মাথায় ঘোমটা দিয়ে থাকে, আমিও নয় তাদের মতো—'

'চলে যা বলছি রোঘো।' কৃষ্ণপ্রেম ধৈর্য হারিয়েছেন: 'এবার তোর মাথা আমি ভেঙে ফেলব।'

'খুব বোষ্টুম হয়েছ যা হোক।'

এক-আধবার নয়, দিনের পর দিন, বছরের পর বছর। শেষ পর্যন্ত বৈষ্ণবদের সঙ্গ অনেকটা অভ্যাস হয়ে গেছে, তবু রঘুনাথের মনের জ্বালা মেটেনি। এ জ্বালা কি মেটবার।

আজ খানাকুল কৃষ্ণনগরে ভগবানই সুযোগ বুঝে এনে ফেলেছেন। যা করবার

এখুনি করে ফেলতে হবে। রঘুনাথ গিয়ে ভট্চায বাড়ির দরজায় ঘা দিল।

কৃষ্ণপ্রেম কিন্তু এসব কিছুই টের পেলেন না। হরিদাসের সঙ্গে সবাই মিলে যখন গোপীনাথজীর মন্দিরে গিয়ে পৌঁছুলেন, তখন আশপাশ তাকিয়ে দেখলেন একবার। রঘুনাথকে চোখে পড়ল না। ভাবলেন, আছে কাছাকাছি কোথাও—কোন্ চুলোয় আর যাবে, না মরা পর্যন্ত তো আর সঙ্গ ছাড়বে না!

মন্দিরের সামনে তখন সংকীর্তনের আসর বসে গেছে, মাথুর শুরু হয়ে গেছে, ভক্ত গায়ক গান ধরেছেন :

'অক্রূর সারথি নিরদয় অতি
রথ যায় দূরে চলে—
আর গোপিকার প্রাণ ভেঙে খান খান,
ব্রজ ভাসে যে নয়নজলে—'

ঝাড়লণ্ঠনের আলোয় ঝলমল করছে প্রাঙ্গণ, আসর জমজমাট, চারদিকে 'আহা—আহা' আর দীর্ঘনিঃশ্বাসের শব্দ, ধূপ-চন্দন-ফুলের সঙ্গে বৈষ্ণব-সেবার জন্যে লুচি ভাজার গন্ধ—কৃষ্ণপ্রেম তন্ময় হয়ে বসে রইলেন। বোধহয় ঘণ্টা-খানেক কেটেছে, হঠাৎ পেছন থেকে রঘুনাথ ফিস্‌ফিস্ করে ডাকল : 'প্রভু!'

ঘাড় ফিরিয়ে কৃষ্ণপ্রেম বললেন, 'কী হয়েছে?'

'একবারটি আসরের বাইরে আসুন। জরুরি কথা আছে।'

'বিরক্ত করিসনি। এখন আমি যেতে পারব না।'

'দয়া করে একবার উঠুন না কর্তা?'

'কী আরম্ভ করলি রোঘো? আসরে ভক্তরা বিরক্ত হবেন।'

'বয়ে গেল!' —রঘুনাথ চাপা গলাতেই বেশ ঝাঁঝালোভাবে বললে, 'ইদিকে আমার জীবন-মরণ সমিস্যে, আপনার ভক্তদের আমি থোড়াই কেয়ার করি। আপনি উঠে আসবেন কিনা বলুন, নইলে আমি ডাক-চিৎকার ছাড়ব তা বলে দিচ্ছি!'

'উঃ, কী কুক্ষণেই যে তুই আমার পেছু নিয়েছিলি, আমাকে পাগল করে তবে ছাড়বি!' —কৃষ্ণপ্রেম গজ গজ করতে করতে আসর ছেড়ে উঠে এলেন। দরজার কাছে এসে বললেন, 'বল্ এবার তোর জীবন-মরণ সমিস্যেটা কী!'

'এখানে হবে না, বাইরে চলুন। নিরিবিলি দরকার।'

'নিরিবিলি কেন? —কৃষ্ণপ্রেম ভ্রূকুটি করলেন : 'কোথাও চুরি-ডাকাতি করে এলি নাকি?'

'দুর্গা—দুর্গা' বলেই জিভ কাটল রঘুনাথ : 'রাধে মাধব, রাধে মাধব!

এ্যাদ্দিন আপনার চেলাগিরি করে শেষে চুরি-ডাকাতি করতে যাব? কী যে বলেন!'

'তবে মতলবটা কী?' কৃষ্ণপ্রেম একবার সন্দিগ্ধভাবে রঘুনাথের দিকে তাকালেন: 'পরামানিকের ছেলে, হাড়ে হাড়ে তোর চালাকি। কী এঁচেছিস বল্‌তো রোঘো?'

'বলছি তো, বাইরেই আসুন না একবার। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আপনিই তো খালি কথা বাড়াচ্ছেন!'

'আচ্ছা, চল্‌—' গোসাঁই হাল ছেড়ে দিলেন: 'কিন্তু মনে থাকে যেন, কোনো চালাকি করলে একেবারে মাথা ভেঙে দেব।'

'বৈষ্ণব মতে ভাঙবেন তো কর্তা?'

'চোপ্‌!'

দুজনে বেরিয়ে এলেন বাইরে। মন্দির ছাড়িয়ে, জমিদারবাড়ি ছাড়িয়ে। রঘুনাথ আর থামে না, শেষ পর্যন্ত একটা অন্ধকার আমবাগানের দিকে এগিয়ে চলল সে।

কৃষ্ণপ্রেম দারুণ সন্দেহে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

'এই রোঘো, ও জঙ্গলের দিকে কোথায় চললি? সত্যি বল্‌তো, তোর মতলবটা কী?'

রঘুনাথ জবাব দিলে না। তার আগেই আমবাগানের ভেতর থেকে তিন চারজন লোক বেরিয়ে এল হঠাৎ। কৃষ্ণপ্রেম কিছু বলবার আগেই তারা তাঁকে চেপে ধরল, তারপর সোজা তুলে ফেলল চ্যাংদোলা করে।

'আহা—আহা—করেন কি! করেন কি—!' কৃষ্ণপ্রেম চেঁচিয়ে উঠতে গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে একজন হাত চাপা দিলে তাঁর মুখের ওপর। বললে, 'বেশি চেঁচামেচি কোরো না রায়, তা হলে একটানে তোমার দাড়ি-ফাড়ি সব উপড়ে নেব। মনে থাকে যেন।'

রায়! কৃষ্ণপ্রেম কথা বলতে পারলেন না—কেবল চোখ দুটো কপালে তুলে চেয়ে রইলেন।

সেই লোকটিই বললে, 'এবার ঠিক পাকড়াও করা গেছে। চলো হে, আর সময় নষ্ট করা নয়। বাবাজীরা টের পেয়ে গেলে বাগড়া দেবে, ভারী গোলমাল হবে তখন। এখন আসামীকে জায়গামতন পেঁছে দিয়ে তবে আমাদের ছুটি। তারা তারা।'

চ্যাংদোলা করে কৃষ্ণপ্রেমকে নিয়ে তারা আমবাগানে ঢুকল। পেছনে পেছনে ছায়ার মতো চলল রঘুনাথ, চাপা হাসিতে সমস্ত মুখ তার ভরে উঠেছে। হর্তুকীর প্রতিশোধ একেই বলে!

॥ দুই ॥

মুকুন্দ ভট্‌চাযের গিন্নী সদর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। চাঁদের আলোয় ঝলমল করছে চারদিক, বসন্তের হাওয়া বইছে, দূরে গোপীনাথজীর মন্দির থেকে খোল-করতাল আর কীর্তনের সুর ভেসে আসছে। জ্যোৎস্নায় ধোয়া পথটা একেবারে নির্জন। অনেকক্ষণ ধরে একভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, কিন্তু এখনো ওদের কাউকে দেখতে পাচ্ছেন না। তবে কি ধরে আনতে পারল না? হাতের কাছে এসে আবার পালিয়ে গেল? অভাগা ছোট বোনটার কথা ভেবে ভট্‌চার্যগিন্নীর চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।

সেই সময় হুড়মুড় করে একটা আওয়াজ উঠল খিড়কির দিকে। যেন দুমদাম করে ঢুকে পড়ল অনেক লোক। ভট্‌চার্যগিন্নী ব্যতিব্যস্ত হয়ে ছুটে গেলেন ভেতর দিকে।

চাঁদের আলোয় আলোয় স্নান করছে উঠোন। আর সেই উঠোনে সেই তিনচারটি লোকের হাতে তখনো চ্যাংদোলা হয়ে ঝুলছেন কৃষ্ণপ্রেম। ভট্‌চায-গিন্নী চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ওমা—ই কি!'

দলের নেতা মুকুন্দ ভট্‌চায ছড়া কেটে বললেন, 'গুরু মশাই, গুরু মশাই, তোমার পোড়ো হাজির! সদু, এইবার কান ধরে বেশ করে পাক দাও আর তোমার পাঠশালায় পাঠ দাও।'

এতক্ষণে শূন্য থেকে ধপাস করে মাটিতে নামলেন কৃষ্ণপ্রেম। তারপর হাঁ করে চেয়ে রইলেন। সদু অর্থাৎ সৌদামিনী অবাক হয়ে গালে হাত দিয়ে বললেন, 'ওমা, এই নাকি ভারত!'

'ভারত মহাভারত যাই হোক, সন্দেহ হচ্ছে ইনি তিনিই। তা মুখে তো হাতখানেক দাড়ি-গোঁফ গজিয়েছে, সেগুলো মুড়িয়ে না ফেললে ব্যাপারটা এখনো ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। ওহে রঘু!'

রঘুনাথ এগিয়ে গেল। কৃষ্ণপ্রেম একবার বজ্রদৃষ্টি ফেললেন তার দিকে, কথা বলতে পারলেন না।

মুকুন্দ বললেন, 'জাত-ব্যবসা কিছু মনে আছে, না সব বৈষ্ণব-সঙ্গে ভুলে মেরে দিয়েছ রঘুনাথ?'

রঘুনাথ বিনয়ে হাত কচলাতে লাগল: 'এজ্ঞে, ও কি আর ভোলবার জিনিস? অস্তর পেলেই দেখিয়ে দিতে পারি।'

মুকুন্দর ছোট ভাই হেরম্ব উৎসাহিত হয়ে বললে, 'পরামানিক বাড়ি থেকে

খুর চেয়ে আনব দাদা?'

রঘুনাথ বললে, 'এজ্ঞে রাত্তিরে বরং থাক। চারটিখানি দাড়ি তো নয়, এক গাড়ি। রাত্তিরে ও-সব ঝোপ-জঙ্গল সাফ করতে গেলে কেটেকুটে যেতে পারে। আমি বলি, শুভকাজটা সকালেই হবে।'

কৃষ্ণপ্রেম এবার উঠে দাঁড়ালেন : 'এ সবের অর্থ কী? কেন নিরীহ বৈষ্ণবকে উৎপীড়ন করছেন? কে আপনারা?'

ভ্রূকুটি করে মুকুন্দ বললেন, 'ন্যাকা আর কি! ভাজা মাছটাও তো উল্‌টে খেতে জানো না! আমার নাম মুকুন্দ ভট্টাচার্য। আর সামনে এই যে ইনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন, এ'র নাম সৌদামিনী—সারদা গাঁয়ের আচার্যিদের লীলাবতী বলে যে মেয়েটাকে বিয়ে করে তুমি উধাও হয়েছিলে, ইনি তারই দিদি। বিয়ের সময় এর হাতের দুটো-চারটে কানুটি খেয়েছিলে, এখনো হয়তো সে-কথা তোমার মনে থাকতে পারে!'

কৃষ্ণপ্রেম অর্থাৎ ভারত এবার গুম হয়ে বসে রইলেন। এতক্ষণে মনে পড়ল, ঠিক বটে—তাঁর বড়ো শালীর তো খানাকুল-কৃষ্ণনগরেই বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু নিজের বিয়েটা হঠাৎ করে ফেলে বাড়িতে সেই গণ্ডগোল। তারপর বিষয়সম্পত্তির ঝামেলা। বর্ধমানের জেলখানা থেকে সেই কোনোমতে পালিয়ে যাওয়া—তারপর এত বছর দেশ-বিদেশ ঘুরে শেষে এই বৈষ্ণবের জীবন—এত কি আর খেয়াল থাকে! যদি থাকত, খানাকুল-কৃষ্ণনগরের ত্রিসীমানায় পা দিতেন তিনি? কিন্তু হতভাগা রঘু ঠিক মনে রেখেছে, আর এসব তারই শয়তানী!

রঘুর দিকে চেয়ে দেখলেন একবার। চাঁদের আলোয় বত্রিশটা দাঁত তার আনন্দে জ্বল জ্বল করছে। ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত জ্বলে উঠল তাঁর। চিৎকার করে বললেন, 'দূর হ রোঘো, দূর হয়ে যা আমার সামনে থেকে।'

মুকুন্দ বললেন, 'এ আমার বাড়ি, তুমি এখান থেকে ওকে দূর করবার কে হে? এখন ভালোয় ভালোয় ঘরে উঠবে, না চ্যাংদোলা করে আবার তুলতে হবে আমাদের?'

জোয়ান ভাই হেরম্ব তখনই তৈরী, বাড়ির চাকর মধু আর জ্ঞাতিভাই শ্রীপদও এগিয়ে এল। কিন্তু সৌদামিনীই বাধা দিলেন এবার। বললেন, 'কী ষণ্ডামি হচ্ছে তখন থেকে? তোমাদের বাড়ির ধারাই এই, কাউকে ধরে আনতে বললে তোমরা বেঁধে আনো। ছি—ছি, এমন করে কেউ কুটুম আনে?'

'নইলে আসতেন নাকি বাবাজী? টের পেলেই লম্বা দিতেন।'

'হয়েছে, থামো।' —সৌদামিনী এগিয়ে এলেন ভারতের দিকে। সস্নেহে হাত ধরলেন তাঁর।

'কিছু মনে কোরো না ভাই, এরা এইরকমই চোয়াড়ে। বললুম, মিষ্টি কথায় ভারতকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে একটিবার নিয়ে এসো আমার কাছে, তা নয়

—একেবারে ডাকাতি করে আনল। তুমি কিছু মনে কোরো না—ঘরে এসো।'

রঘুনাথ ফোড়ন কেটে বললে, 'আজ্ঞে হাঁ, এবার ভালো ছেলের মতো ঘরে উঠুন, জামাই আদরে খাওয়া-দাওয়া করুন। আর আমার জন্যেও দয়া করে একটু প্রসাদ রাখবেন কিন্তু।'

ভারত সংক্ষেপে বললেন, 'চোপ্!'

সৌদামিনী আবার বললেন, 'এসো ভাই—মাপ করো আমাদের।'

ভারত এবার নিঃশব্দে সৌদামিনীকে অনুসরণ করলেন। এতক্ষণে বুঝতে পেরেছেন, 'ভবিতব্যং ভবত্যেব'—তার হাত থেকে কারো নিস্তার নেই। নইলে রঘুনাথই বা তাঁর সঙ্গ ছাড়বে না কেন, আর কেনই বা চলতে চলতে এ-ভাবে খানাকুলে এসে পৌঁছুবেন? সবই শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা, যা হওয়ার তাই হোক।

সে রাতে উৎসব শুরু হয়ে গেল ভট্চায বাড়িতে। অন্ধকারেই পুকুরে জাল ফেলে মাছ তুলল হেরম্ব, গোয়ালপাড়ায় গিয়ে মুকুন্দ ভালো ক্ষীর জোগাড় করে আনলেন। কিন্তু অনেকদিনের অনভ্যাসে ভারত মাছ মুখেই তুলতে পারল না, মনের অনিশ্চয়তায় ক্ষীরও বিস্বাদ লাগল—সবটাই প্রসাদ হয়ে রইল রঘুনাথের জন্যে।

খাওয়া-দাওয়ার পরে যে ঘরটিতে এনে সৌদামিনী তাঁকে শুইয়ে দিয়ে গেলেন, তার দক্ষিণে পশ্চিমে দুটি জানলা। দক্ষিণের জানলা দিয়ে বসন্তের হাওয়া আর নিমফুলের মিঠে গন্ধ আসছে, বালিশ থেকে মাথা উঁচু করে তাকালে পশ্চিমে সেই দীঘিটার জ্যোৎস্নায় উজ্জ্বল জলটা চোখে পড়ে। ভারত ঘরটির দিকে ভালো করে চেয়ে দেখলেন। কুলুঙ্গিতে পেতলের বড়ো একটা প্রদীপ জ্বলছে, দেওয়ালে কালীঘাট আর কামাখ্যার দুখানা পট। ভট্চাযেরা শাক্ত। দীর্ঘ পথের ক্লান্তির পরে সেবাযত্ন দিয়ে পাতা এই নরম বিছানাটিতে গা এলিয়ে সব তাঁর কেমন অবাস্তব মনে হল। দূর থেকে এখনো সংকীর্তনের সুর আসছে, মোহান্ত গোসাঁই এখন তাঁর খোঁজ করছেন কিনা কে জানে! কীর্তনের সুরটা যেন ক্রমশ তাঁকে পেছনে ফেলে কোথায় সরে যাচ্ছে—যেন নীলাচলের সমুদ্রতীর থেকে অনেক দূরে কোথায় এগিয়ে চলেছেন তিনি, ধীরে ধীরে অস্পষ্ট হয়ে আসছে সাগরের ডাক। ভারতের চোখ বুজে এল।

আর ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন, সেই না-ঘুম না-জাগার ভেতরে, নিজের অতীতটা ছায়া-ছায়া আর ছাড়া-ছাড়া ছবির মতো চেতনার ওপর ভেসে বেড়াতে লাগল। ভুরশুটের পেঁড়ো গ্রামে তাঁদের সেই ঐশ্বর্য, সেই প্রতাপ—তাঁর বাপ নরেন্দ্রনারায়ণ রায়কে লোকে 'রাজা' বলত। তারপরে কী তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে বর্ধমানের মহারানী বিষ্ণুকুমারীর সঙ্গে বিরোধ, দশ হাজার সৈন্য বর্ধমান থেকে এসে গড় আক্রমণ করল—সর্বস্ব গেল, কোনোমতে পালিয়ে প্রাণ বাঁচালেন সবাই। তারপর দুর্দিন। বাড়ির ছোট ছেলে ভারত মানুষ হওয়ার

জন্যে মামাবাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নিলেন, সংস্কৃত শিখতে লাগলেন, সেখান থেকে সারদা গ্রামের আচার্যদের বাড়িতে, লীলাবতীর সঙ্গে বিয়ে—

লীলাবতী। আট ন' বছরের সেই ফুটফুটে ছোট্ট মেয়েটি। কতদিন হলো? প্রায় সতেরো আঠারো বছর। এর মধ্যে স্ত্রীর সঙ্গে আর তাঁর দেখা হয়নি। এতদিনে সে কি তাঁকে মনে রেখেছে? দেখলেও কি আর চিনতে পারবে?

অথচ সম্পূর্ণ দোষও তাঁর ছিল না। বাড়ির কাউকে না জানিয়ে কুল ভেঙে বিয়ে করেছেন, সংস্কৃত পড়েছেন—দেশে ফেরবার সঙ্গে সঙ্গে যেন ঝড় উঠল। বাবা মুখ ফিরিয়ে রইলেন, মা অভিমানে ঘরে দরজা বন্ধ করলেন, তিন দাদা সমস্বরে বলতে লাগলেন, 'ছিঃ ছিঃ ভারত, তোর এই কাজ? ভেবেছিলুম তোর বুদ্ধি আছে, লেখাপড়া শিখে ভাঙা সংসারটাকে তুই দাঁড় করাবি—আর তুই পড়ে এলি সংস্কৃত? কী হবে সংস্কৃত দিয়ে, এ-কালে কে তার কদর করে? ফার্সী পড়লে অন্তত মুর্শিদাবাদ নবাব-দরবারে গিয়ে দাঁড়াতে পারতিস, একটা গতি হতো আমাদের। তারপর কোন্ এক আচার্যি বাড়ির মেয়েকে বিয়ে করলি—বংশের মান-সম্মান—'

বিরক্ত হয়ে বাড়ি ছাড়লেন ভারতচন্দ্র। এবার দেবানন্দপুর। রামচন্দ্র মুন্শীর আশ্রয়ে ফার্সী পড়া। বাড়ি ফিরে এলেন, সবাই খুশি হলেন। বাবা তখন বর্ধমানের সঙ্গে রফা করে রাজসরকার থেকে কিছু জমিজমা ইজারা নিয়েছেন। বললেন, 'তুমি তো ফার্সী পড়ে এবার সত্যিকারের বিদ্বান হয়েছ —এখন বর্ধমানে গিয়ে আমাদের মোক্তার হয়ে থাকো। খাজনাপত্রের কোনো গোলমাল না হয়, রাজা কীর্তিচন্দ্র আমাদের ওপর রাগ না করেন, মহারানী বিষ্ণুকুমারী যাতে খুশি থাকেন, সে-সব দিকে নজর রেখো। তুমি বুদ্ধিমান-বিচক্ষণ—বেশি কথা তোমাকে আর কী বলব।'

বর্ধমানে গেলেন ভারতচন্দ্র। কিন্তু নরেন্দ্রনারায়ণের শত্রুর অভাব ছিল না, দরবারের চক্রান্তে বর্ধমানরাজ ইজারা জমিটুকু কেড়ে খাস করে নিলেন, বাকী খাজনার দায়ে ভারতকে কয়েদখানায় যেতে হল। সে কী লজ্জা, আর কী অপমান! ভাগ্যিস কোতোয়াল ধর্মভীরু লোক, নির্দোষ ব্রাহ্মণ-সন্তানকে নির্যাতন করতে তার খারাপ লাগছিল, তার দয়ায় গোপনে মুক্তি পেলেন ভারত। তারপর আর বর্ধমান নয়—বাংলা দেশ নয়—উড়িষ্যা পেরিয়ে একেবারে বর্গী অধিকারে, কটকে। সোজা গিয়ে হাজির হলেন সুবেদার শিবভট্টের কাছে। সুবেদার বর্গী হলেও দয়ালু লোক, ভারতচন্দ্রের দুঃখের কথা শুনে তাঁর মন গলে গেল।

শিবভট্ট সমস্ত কর্মচারী, মঠধারী আর পাণ্ডাদের কাছে এক হুকুমনামা পাঠালেন। ভারতচন্দ্র এবং তাঁর ভৃত্য যতদিন খুশি—যে মঠে ইচ্ছে, নীলাচলে থাকতে পারবেন। তাঁর আদর-যত্নে কোনো ত্রুটি হবে না, প্রত্যেক দিন তাঁকে

একটি করে 'বলরামের আট্‌কে ভোগ'ও দেওয়া হবে। বিনা করে, অবাধে তীর্থবাসের অধিকার দেওয়া হল তাঁকে।

পুরীধামে স্থায়ী হলেন ভারতচন্দ্র—স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলেন। তারপর মঠে থাকতে থাকতে ক্রমশ ধর্মের দিকে মন গেল। 'গম্ভীরা'য় অহোরাত্র ভক্তের কীর্তন; 'সিদ্ধ বকুলে' বৈষ্ণবের উচ্ছ্বসিত চোখের জল; দিকে দিকে মহাপ্রভুর স্মৃতি; রায় রামানন্দ, ভক্ত হরিদাস, সার্বভৌম, সনাতনের কাহিনী—যেন আর-এক জীবনের সন্ধান পেলেন তিনি। ভারত বৈষ্ণব হলেন। ভেবেছিলেন, জীবনটা এইভাবেই শেষ পর্যন্ত কেটে যাবে, কিন্তু কেন যে এই দলটার সঙ্গে তাঁর বৃন্দাবন যাওয়ার দুর্মতি হল, কেন যে তিনি উড়িষ্যার নিরাপদ গণ্ডী থেকে বেরিয়ে এলেন! আর তারই ফলে—

ওই রঘুটাই যত গণ্ডগোলের গোড়া। ওই হল নাটের গুরু নিত্যানন্দ!

কিন্তু হতভাগার ওপর রাগই বা করবেন কী করে? গ্রামের লোক, তিন পুরুষ ধরে তাঁদের পরিবারের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে। যখন পড়তে যান, সঙ্গে ছিল, বিয়ের সময় ওই হতভাগাই তো গৌরবচন শুনিয়েছিল। রামচন্দ্র মুন্‌শীর বাড়িতে ফার্সী পড়বার সময়েও ও তাঁর সঙ্গ ছাড়েনি। তারপরে বর্ধমান—সেখানেও রঘুনাথ। বর্ধমানের হাজত থেকে পালানোর পথেও সে-ই সঙ্গী। জাজপুরে যখন দুরন্ত অসুখে মরণাপন্ন হয়ে পড়েন, তখন এই রঘুনাথই তাঁকে সেবাযত্ন করে বাঁচিয়ে তুলেছিল। বৈষ্ণব হলেন, রঘুনাথও তাঁর পিছু ছাড়ে না। শেষ পর্যন্ত—

এ লোকটাকে না হলে তাঁর একদণ্ডও চলে না, অথচ হতভাগা কী ধূর্ত!

কিন্তু লীলাবতী—

খুট করে বাইরে একটা আওয়াজ হল, ভারতচন্দ্র চোখ খুললেন। তার অর্থ, দরজার যে শিকলটা বাইরে থেকে আটকে রাখা হয়েছিল, সেটা খুলে ফেলল কেউ। দরজার দিকে তাকালেন ভারতচন্দ্র। সৌদামিনী দাঁড়িয়ে। আকাশ-ধোয়া জ্যোৎস্নার ঝলক পড়েছে তাঁর গায়ে—কেমন অবিশ্বাস্য মনে হল তাঁকে। যেন প্রথমটায় তিনি ভালো করে চিনতেই পারলেন না।

দরজার গোড়া থেকে সৌদামিনী ডাকলেন, 'ঘুমুচ্ছ ভাই?'

'না দিদি, জেগেই আছি। কিন্তু রাত বোধহয় দুপহর পেরিয়ে গেল, একটু আগেই শেয়ালের ডাক শুনছিলুম। আপনারা এখনো শোননি?'

'আমাদের কি এত তাড়াতাড়ি শুলে চলে? বাসন-কোসন ধুয়ে সব তুলতে হল ঘরে। এদিকে আজকাল চোরের উৎপাত বেড়েছে, তার সঙ্গে আবার কীর্তনের আসর বসেছে, একটু সাবধান থাকতে হয়।'

ভারতচন্দ্র উঠে বসলেন। হাসলেন।

'কীর্তনের সঙ্গে চোরের সম্পর্ক কী, দিদি? তুমি কি ভাবো বৈষ্ণবদের ঝোলায় সিঁদকাঠি থাকে?'

সৌদামিনী জিভ কাটলেন। বললেন, 'ছি! ছি! আমরা বৈষ্ণব নই, তাই বলে অমন কথা বলতে পারি কখনো? মহাপাপ হবে যে! তা নয়। কিন্তু এ-সব গান-টান হলে সবাই মিলে শুনতে যায়, রাত্তিরে বাড়িতে কেউ থাকে না, সেই ফাঁকে চোর এসে ঢোকে।'

'তাই বলো।'

সৌদামিনী ঘরে এলেন। প্রদীপের আলোয় আবার ভালো করে চেয়ে দেখলেন ভারতের দিকে। বললেন, 'কী কাণ্ডটাই করেছ বলো তো! এমন টকটকে গায়ের রঙ রোদে পুড়ে গেছে, এক মাথা ঝাঁকড়া চুল, সারা মুখে দাড়ি। রঘু এসে খবর না দিলে কেউ তো তোমায় চিনতেই পারত না।'

ভারতচন্দ্র নিঃশব্দে হাসলেন, জবাব দিলেন না।

'এবার কী করতে চাও?'

ভারত চুপ করে রইলেন।

'আবার পালাবার ফন্দী?'—সৌদামিনী হাসলেন: 'সে পথ বন্ধ চির-কালের মতো। হেরম্ব সারদা রওনা হয়ে গেছে। কাল দুপুরের ভেতরেই লীলাকে নিয়ে এসে পড়বে।'

ভারত চমকে উঠলেন।

'এই রাতে! বলো কি দিদি?'

'কোনো ভাবনা নেই ভাই, হেরম্বের হাতে লাঠি থাকলে চোর-ঠ্যাঙাড়ে ওর ত্রিসীমানায় আসতে পারবে না। এ পরগণায় সবাই ওকে জানে।'

'সে কথা আমি ভাবছি না দিদি। কিন্তু কাজটা ভালো হয়নি।'

'কেন ভালো হয়নি?'

একটু চুপ করে থেকে ভারত বললেন, 'আমি এখনো মন স্থির করতে পারিনি। তা ছাড়া—তা ছাড়া লীলার কাছে আমি মুখ দেখাতে পারব না।'

'সে পারো কিনা আমরা বুঝব। সকালে দাড়ি গোঁফ কামিয়ে দিলেই চাঁদ-মুখখানা আবার ফুটে উঠবে।'

'দিদি, ঠাট্টা নয়। আজ এত বছর ধরে জীবনটা একভাবে কেটে চলেছে। ঘর-সংসার করিনি, করবার কথাও ভাবিনি। এই বুড়ো বয়সে এখন আর—'

সৌদামিনী বাধা দিলেন। বললেন, 'তুমি কুলীনের ছেলে, ফুলের মুখুটি, এ-সব কথা তোমার মুখে মানায় না। তোমাদের তো আশী বছর অবধি বিয়ে করার রেওয়াজ আছে। বাজে বকতে হবে না, এবার লক্ষ্মীছেলের মতো সংসার পাতো, ঘরকন্না করো।'

'কী করে সংসার পাতবো? আমার চাল-চুলো কিছু নেই। পেঁড়োতে আমি আর ফিরব না। বাড়ির জন্যেই আমার এই দুর্গতি। দাদারা যদি তখন আমায়

একটু সাহায্য করত, তা হলে অমন করে আমাকে বর্ধমানে কয়েদ যেতে হতো না। সব দোষ আমার ঘাড়ে পড়ল। না দিদি, সংসার আমাকে দিয়ে হবে না। এতদিন বিবাগী হয়ে কাটিয়েছি, বাকী জীবনটাও কাটিয়ে দেব।'

'তুমি না পুরুষ মানুষ?'—সৌদামিনী ভ্রূকুটি করলেন : 'এত লেখাপড়া কি মিথ্যেই শিখেছিলে তা হলে? কোথাও একটা কাজকর্ম তুমি জুটিয়ে নিতে পারবে না?'

'কোথায় যাব? বর্ধমানের পাইক-পেয়াদা আমাকে একবার পেলে আর ছাড়বে না, টানতে টানতে আবার নিয়ে গিয়ে কয়েদে পুরে দেবে। আমার ওপরে রাগ ওদের এখনো যায়নি।'

'বর্ধমানের রাজত্বের বাইরে কি আর দেশ নেই?'

ভারতচন্দ্র আবার চুপ করে রইলেন। কথাটার জবাব ঠিকমতো খুঁজে পাওয়া গেল না।

'ঠিক বুঝতে পারছি না, দিদি। নতুন করে জীবন শুরু করবার সাহস আর আমার নেই। তার চাইতে আমাকে তোমরা ছেড়ে দাও—যেদিকে আমার চোখ যায়, চলে যাই।'

'আর লীলার কী হবে?'

'কিছুই হবে না। এতদিন যে-ভাবে কেটেছে, সেইভাবেই কেটে যাবে।'

'তুমি মেয়েমানুষেরও অধম—' সৌদামিনীর চোখ দিয়ে আগুন ঝরতে লাগল : 'বেশ, তাই যাও। তোমাকে আনাই আমাদের ভুল হয়েছে। ভুরশুট রাজবংশের ছেলে যে এমন অপদার্থ হয়, স্বপ্নেও আমার তা জানা ছিল না। এসো আমার সঙ্গে, নিজের হাতে আমি সদর দরজা খুলে দিচ্ছি, কেউ তোমাকে বাধা দেবে না।'

মাথা নিচু করে বসে রইলেন ভারতচন্দ্র। লজ্জায় অপমানে চোখ তুলে চাইতে পারলেন না।

'কই, উঠে এসো।'

ভারতচন্দ্র বললেন, 'না থাক। আজকের রাতটা আমি ভেবে দেখি।'

সৌদামিনী নরম হলেন। বললেন, 'ভাবনার তো কিছু নেই ভাই। সত্যিই যদি তুমি সন্নিসী হয়ে যেতে, আমরা কেউ তোমায় পেছু ডাকতুম না। কিন্তু তুমি তো সাধু হওনি—রাগে দুঃখে বাউন্ডুলে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ। শুধু নিজের জীবনটাই নষ্ট করছ তাই নয়—লীলার যে এতগুলো বছর কিভাবে কাটছে, সে-ও তুমি বুঝতে পারছ না। কাল লীলা আসুক, একবার ভালো করে চেয়ে দেখো তার মুখের দিকে, তারপর তোমার ধর্ম যা বলে তাই কোরো।'

ভারতচন্দ্র আবার মাথা নামালেন। গোপীনাথের মন্দিরে কীর্তন আর শোনা যায় না। এতক্ষণে বৈষ্ণবেরা সেবায় বসেছেন। আর মোহান্ত বাবাজী হয়তো ডেকে ডেকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন : 'কৃষ্ণপ্রেম? বাবাজী কৃষ্ণপ্রেম? সে কোন্

দিকে গেল হে? তাকে তো দেখতে পাচ্ছি না।'

হায়, মোহান্ত যদি ঘুণাক্ষরেও জানতেন!

সৌদামিনী বললেন, 'কিন্তু আর নয় ভাই, রাত অনেক হয়েছে, তুমি ঘুমোও। কর্তা দরজায় শিকল দিয়ে গিয়েছিলেন, আমি খুলেই রাখলুম। পালাতে ইচ্ছে হয়, পালিয়ো—কিন্তু লীলার কথাটা একবার ভেবে দেখো।'

সৌদামিনী বেরিয়ে গেলেন। পেছনে নিঃশব্দে বন্ধ হয়ে গেল দরজাটা।

ভারতচন্দ্র কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন, তারপর ধীরে ধীরে নেমে এলেন খাট থেকে। হ্যাঁ, এখুনি তিনি পালাতে পারেন এখান থেকে, গোপীনাথজীর নাটমন্দিরে গিয়ে মিশে যেতে পারেন বৈষ্ণবদের দলে। তখন আর মুকুন্দ ভট্টাচার্যের সাধ্য নেই যে, সেখান থেকে তাঁকে ধরে আনবেন। কিন্তু—

কিন্তু নিজের মনের দিকে চেয়ে দেখলেন একবার। বর্ধমানরাজের উপদ্রবে দেশত্যাগী হয়েছিলেন, নিজের আত্মীয়-স্বজনের ওপর একটা অসহ্য ঘৃণা জন্মেছিল, কিছুদিনের জন্যে শান্তি পেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সত্যি সত্যিই কি মনের ভেতর কোথাও বৈরাগ্যের ছায়ামাত্রও অনুভব করেছেন কখনো? অভ্যাসের ভেতর বছরের পর বছর কেটেছে, মন্দিরে গেছেন, কীর্তনে যোগ দিয়েছেন, মহাজন আর ভক্তদের সঙ্গ করেছেন; কিন্তু কখনো কি সেই অকৈতব কৃষ্ণপ্রেমের স্বাদ পেয়েছেন—যার জন্যে রূপ-সনাতন গৌড় দরবারের সব প্রতাপ-প্রতিপত্তির প্রলোভন ছেড়ে অঙ্গে ব্রজরেণু মাখলেন, রাজার ঐশ্বর্য ছেড়ে ছুটে বেরিয়ে এলেন ভক্ত রঘুনাথ, বাইশ বাজারে 'কোড়া'র ঘায়ে রক্তাক্ত হলেন যবন হরিদাস, তবু কৃষ্ণনাম ত্যাগ করলেন না?

কিছুই হয়নি, শুধু পালিয়ে বেড়িয়েছেন। বরং চৈতন্যভাগবতে শাক্তনিন্দা পড়ে মনে ক্ষুব্ধ প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে। 'শুষ্ক কাষ্ঠের সম আপন দেহ করিতে হয়'—মহাপ্রভু বলেছিলেন। কিন্তু একটি বৃত্তিও তো বশ মানেনি। পরকীয়া তত্ত্বের গূঢ় রহস্যে প্রবেশ করতে গিয়ে লৌকিক বিচার মাথা তোলে—নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর গৃহজীবন তাঁর ভালো লাগে না—'তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়—' এ কথা মেনে নিতে তাঁর মন সাড়া দেয় না। প্রভুপাদ শ্রীনিবাস আচার্য প্রাতঃস্মরণীয়, তাঁর কীর্তির তুলনা নেই, কিন্তু গৃহ-জীবন না হলে কী তাঁর চলত না? তাঁরও গুরু তো দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিলেন, 'স্খলৎপাদ স্খলৎপাদ কহে বারম্বার!'

না—বৈষ্ণব তিনি হতে পারেননি। শুধু দিন কাটিয়ে চলেছেন। জীবন বদলেছেন, কিন্তু মন বদলাতে পারেননি; যেন একটার পর একটা পান্থশালায় দিনের পর দিন কাটিয়েছেন, অভ্যাসে মহাজন-সঙ্গ করেছেন, কীর্তন গেয়েছেন, গান বেঁধেছেন, চোখের জলও ফেলেছেন; কিন্তু অন্তরে কোথাও একটি রেখা পড়েনি, পাষাণ গলেনি, মনের শুকনো ডালে একটি 'প্রেমাঙ্কুর'ও দেখা দেয়নি। মোহান্ত তাঁকে ভালোবাসেন, বিশ্বাস করেন। অথচ সে ভালোবাসা, সেই

বিশ্বাসের এতটুকু মর্যাদা রাখতে পারেননি তিনি।

সৌদামিনীই ঠিক বলেছেন। বৈষ্ণব তো হতে পারেন-ই নি, এদিকে পুরুষ নামেরও অযোগ্য। প্রাণের ভয়ে পলাতক। আঠারো-উনিশ বছর ধরে নিজের স্ত্রীর খবরটুকু পর্যন্ত নেননি—নরাধম আর কাকে বলে!

কপালের ঘাম মুছে আবার অসহায়ভাবে বসে পড়লেন খাটের ওপর। না—আবার পালাবার জো নেই। নিজের মনের কাছে ধরা পড়ে গেছেন, সরল নিষ্ঠাবান.বৈষ্ণবদের কোন্ অধিকারে তিনি প্রবঞ্চনা করবেন? কেমন করে আর সঙ্গ দেবেন তাঁদের? সৌদামিনী দরজা খুলে দিয়েছেন, কিন্তু আজ রাত্রে এই খোলা দরজাই তাঁর সবচাইতে বড়ো বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পরের দিন সকালটা বাবাজী কৃষ্ণপ্রেমের খুব সুখে কাটল না।

প্রথমেই এল পরামানিক। দাড়ি-জটা কামিয়ে নির্মূল করল। মুকুন্দ বলেছিলেন, কাজটা রঘুনাথই করুক, কিন্তু চড়-চাপড় খাওয়ার ভয়ে রঘুনাথ মনিবের কাছে এগোতে চাইল না। গেরুয়ার বদলে এল ধুতি-চাদর। ভারতচন্দ্র প্রতিবাদ করলেন না, ভাগ্যকে তিনি মেনে নিয়েছেন। তারও পরে চাকরটা গিয়ে খবর আনল, বৈষ্ণবের দল সকালেই গ্রাম ছেড়ে আবার বৃন্দাবনের পথে রওনা হয়ে গেছেন। যাওয়ার আগে মোহান্ত বাবাজী অনেকবার কৃষ্ণপ্রেমের খোঁজ করেছিলেন, শেষে ভেবেছেন, কৃষ্ণপ্রেম এগিয়ে গেছেন—পথেই দেখা হবে তাঁর সঙ্গে।

মুকুন্দ বললেন, 'তোমার কোনো ভাবনা নেই ভারতচন্দ্র, এখন দেখলেও আব মোহান্ত তোমাকে চিনতে পারবেন না।'

ভারতচন্দ্র হাসলেন, জবাব দিলেন না।

সৌদামিনী এসে বললেন, 'খুব কষ্ট হচ্ছে, না?'

'না, দিদি।'

সৌদামিনী আশ্চর্য হয়ে চেয়ে রইলেন।

'মিথ্যেই ভেক বয়ে বেড়াচ্ছিলুম, পাপের বোঝা বাড়ছিল। তোমরা তা থেকে আমায় মুক্তি দিলে।'

সৌদামিনী একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'ও-সব তত্ত্বকথা বুঝিনে ভাই। শুধু তুমি সুখী হও, লীলাকে সুখী করো, এর বেশি আর কিছুই চাইনে।'

ভারতচন্দ্র তেমনি আকাশ-পাতাল চিন্তার মধ্যেই তলিয়ে রইলেন সারাদিন। চল্লিশ বছরের সীমায় পৌঁছে আবার নতুনভাবে শুরু করতে হবে জীবনকে। সুখী হতে হবে, লীলাকে সুখী করতে হবে। কিন্তু কেমন করে? পেঁড়োতে তিনি আর যাবেন না, কিছুতেই না। গঙ্গার পশ্চিম কূলে থেকে থেকে বর্গীর

হানা—আরো উত্তরে বর্ধমান রাজসরকারের ভয়। এক মুর্শিদাবাদে যাওয়া চলে, কিন্তু—

কিন্তু নবাব সরকারে গিয়ে উজীর-নাজীরের তোষামোদ করতে আর প্রবৃত্তি হয় না। কিছু জমি-জমা পত্তনি হয়তো নেওয়া চলে, কিন্তু আবার তো সেই বিষয়-সম্পত্তির ঝঞ্ঝাট। তা ছাড়া মুর্শিদাবাদেও এখন নানারকম গণ্ডগোল চলছে, পুরীতে বসেই সে-সব খবর তিনি শুনেছিলেন। চাকরি-বাকরি হয়তো এদিক-ওদিক একটা জুটতে পারে, কিন্তু চাকরি করতে আর তাঁর উৎসাহ হয় না।

বরাবর কবিতা লেখার ঝোঁক—সময় সুযোগ পেলেই কিছু কিছু চর্চা করতেন। মনে আছে, দেবানন্দপুরে রামচন্দ্র মুন্শীর কাছে থেকে যখন তিনি ফার্সী পড়ছেন, তখন বাড়িতে একদিন সত্যপীরের সেবা। দুপুরের পর রামচন্দ্র যখন পুঁথি আনতে পাঠাচ্ছেন, কী খেয়াল হল ভারতচন্দ্রের। বলে বসলেন, 'পুঁথি আনাবার দরকার নেই—আমার কাছেই আছে একখানা।'

রামচন্দ্র খুশি হয়ে বললেন, 'বেশ, তা হলে পুঁথি তুমিই পড়বে। তোমার সংস্কৃত জানা আছে, উচ্চারণ ভালো, চমৎকার গলা। এ ভার তোমারই রইল।'

সত্যপীরের পুঁথি ভারতচন্দ্রের কাছে ছিল না। একবার সরস্বতী আর একবার বিস্‌মিল্লাকে স্মরণ করে কলম ধরলেন তিনি। তারপরেই শুরু হল চন্দ্রকলার কাহিনী :

"শুন সবে একচিত সত্যপীর গুণগীত
দুই লোকে পাবে প্রীত সিদ্ধ মনস্কামনা।
গণেশাদি দেবগণ বন্দ সত্যনারায়ণ
সিদ্ধ দেহ অনুক্ষণ যার যেই ভাবনা॥
কলির প্রথমে হরি ফকির শরীর ধরি
অবনীতে অবতরি হরিবারে যন্ত্রণা—"

সভার সকলে পুঁথি শুনে খুশি হলেন, তারপর ভনিতা শুনে চমকে উঠলেন :

"দেবের আনন্দধাম, দেবানন্দপুর নাম,
তাহে অধিকারী রাম রামচন্দ্র মুন্শী—"

স্বয়ং মুন্শী মশাই এসে জড়িয়ে ধরেছিলেন ভারতচন্দ্রকে।

'তুমি এই পুঁথি নিজে লিখেছ? এত ভালো কবিতা লেখ তুমি? তুমি যে দেখছি স্বয়ং কবি কালিদাস হে। হাতে তোমার একেবারে তৈরী সেহাই কলম!

লেখো লেখো, কবিতা লেখো—দেশ-জোড়া নাম হবে তোমার।'

'আজ্ঞে ভরসা হয় না।'

'কেন? কবিতা লিখবে, তাতে ভয়টা কিসের? দেখো, এতেই তোমার উন্নতি হবে।'

'উন্নতি?'—ভারতচন্দ্র হেসেছিলেন: 'আজকাল কবিতার দাম আর কে দেয় বলুন।'

'দেবে দেবে। সমঝদার হলেই দেবে। ফার্সী কবিতায় পড়োনি?—

"কদরে গোল বুলবুলে বেদানম্ ইয়া চম্বেরী,
কদরে জওহর সা বেদানা ইয়া বেদানদ্ জওহরী"—

মনে আছে?'

'আজ্ঞে মনে আছে বইকি। বুলবুল জানে ফুলের কদর, জহরী চেনে জহরকে। কিন্তু কবিতা—'

'চিনবে হে, চিনবে। এলেমদার আর আক্কলমন্দ্ হলেই চিনবে।'

দেবানন্দপুরের লোকে চিনেছিল।

ওই গ্রামেরই হীরারাম রায়ের অনুরোধে আর একখানি পুঁথিও লিখেছিলেন সত্যপীরের। কিন্তু সেইখানেই শেষ। বাড়ি ফিরে কিছুদিন পরেই বর্ধমান যাত্রা, সেখানে নানা দুর্বিপাক—জীবনের সব আশা ভরসা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল।

নীলাচলে বৈষ্ণবদের সঙ্গে যখন কাটিয়েছেন, তখন মহাজন পদাবলী শুনতে শুনতে মধ্যে মধ্যে গান বাঁধতেন। তার দু একটি কণ্ঠে আছে, বাকীগুলো কখন ছিঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন, কোনো কিছুতেই তাঁর তখন আসক্তি ছিল না। আজ মনে হল, জীবন যদি নতুন করে শুরু করতেই হয়—আবার কবিতা লিখবেন, গান বাঁধবেন, সরস্বতীর আরাধনা করবেন। কিন্তু—

কিন্তু গান বেঁধে, পুঁথি লিখে তো আর পেট চলবে না। রামচন্দ্র মুন্শীর আশ্বাসেও জোর পাচ্ছেন না খুঁজে। মহারাজ বিক্রমাদিত্য আর নেই যে, নবরত্নসভা বসিয়ে কালিদাসের মতো তাঁকে রাজকবি করবেন; মহারাজ ভোজের রাজদরবারে নতুন কবিতা শোনাতে পারলেই কবির মাথায় স্বর্ণমুদ্রার পুষ্প-বৃষ্টি হতো—সে কথা বল্লালের 'ভোজ-প্রবন্ধে' আছে। দিল্লীর বাদশাহ্‌দের যখন আকাশছোঁয়া প্রতাপ, তখনো কবির ভাগ্য নেহাৎ মন্দ ছিল না। বাঙালী একজন কবি লিখেছিলেন, 'একাব্বর নামে রাজা অর্জুন অবতার'—কিন্তু বাদশা আকবরকে অর্জুন না বলে মহারাজা বিক্রমাদিত্য বলা উচিত। তাঁরও 'নবরত্ন' সভা ছিল, আর সেই সভায় ছিলেন জনাব আবদুল রহিম খান-খানান—যিনি কবি গঙ্গকে চার পংক্তি কবিতা রচনার জন্যে চার লক্ষ টাকা পুরস্কার দিয়েছিলেন।

বিক্রমাদিত্য, ভোজরাজ, আকবর, খান-খানান, মহারাজ লক্ষ্মণ সেন—কেউ

নেই। কবি ভারতচন্দ্রকে স্বর্ণমুদ্রা কেন, একমুঠো অন্নও কেউ আর দেবে না। ভারতচন্দ্র দেখলেন, কুলুঙ্গিতে একখানা পুঁথি রয়েছে—লাল খেরোর ওপর বড়ো বড়ো হরফে কালি দিয়ে লেখা : 'কবিকঙ্কণ চন্ডী'। চন্ডীমঙ্গলের গান ছেলেবেলা থেকেই শুনে আসছেন, জেনেছেন, হতভাগ্য ঘরছাড়া মুকুন্দরামও শেষ পর্যন্ত আবড়া গ্রামে জমিদার বাঁকুড়া রায়ের আশ্রয় পেয়েছিলেন, তারপর 'চন্ডী দেখা দিলেন স্বপনে'—কবি চন্ডীমঙ্গল লিখলেন। ভারতচন্দ্রের হাসি পেলো। সারা দেশ জুড়ে বিশৃঙ্খলা। রাজা-জমিদারেরা মান-প্রাণ নিয়ে কোনো-মতে বেঁচে থাকতে চায়, চারদিকে চোর-ডাকাতের উপদ্রব, পথেঘাটে ঠগী আর ঠ্যাঙাড়ে নির্বিচারে মানুষ মারছে, পথিক যদি থানার কোতোয়ালীতে আশ্রয় নেয়, তা হলে মাঝরাতে দারোগাই তার গলা কেটে সর্বস্ব লুট করে। তান্ত্রিকেরা ছেলে চুরি করে বলি দেয়, বৌ-ঝি কেড়ে নিয়ে গিয়ে ভৈরবী বানায়। এখন আর রাজা-জমিদার কবিকে শিরোপা দিয়ে সভায় নিয়ে বসায় না—দিনে দুপুরেই যখন ডাকাতে এসে চড়াও করে, তখন চন্ডী আর কাউকেই রক্ষা করেন না। এতদিন বৈষ্ণবদের সঙ্গে ছিলেন, সত্যিকারের ভক্ত-সজ্জন অনেক দেখেছেন, কিন্তু পরকীয়া সাধনার নামে আখড়ায় আখড়ায় মধ্যে মধ্যে যা চোখে পড়ে, তা দেখলে ক্ষমা আর করুণার অবতার শ্রীগৌরাঙ্গও সইতে পারতেন না—তাঁকেও শ্রীকৃষ্ণমূর্তিতে সুদর্শন ধারণ করতে হতো।

কী কবিতা লিখবেন ভারতচন্দ্র? কার জন্যে লিখবেন?

মুকুন্দ ভট্টাচার্য ঘরে ঢুকলেন। বললেন, 'কী ভায়া, এখনো কি শ্রীবৃন্দাবনের জন্যে মন উড়ু-উড়ু করছে?'

ভারতচন্দ্র হাসলেন, জবাব দিলেন না।

একটা চৌপাই টেনে বসে পড়লেন মুকুন্দ। জিজ্ঞেস করলেন, 'কী ঠিক করলে?'

'ভাবছি।'

মুকুন্দ একটু কাশলেন। বললেন, 'আমি বলি কি, তুমি বরং কলকাতায় চলে যাও।'

'কলকাতা? কী করব সেখানে?'

'ইংরেজের কুঠি হয়েছে—কেল্লা হয়েছে। নতুন শহর পত্তন হয়েছে সেখানে। শুনেছি যাদের ঘরে হাঁড়ি চড়ত না, তারা কোম্পানির দালালী করে রাতারাতি বাড়ি-গাড়ি-বাগান করে ফেলছে। তুমিও দেখো না চেষ্টা করে।'

'দালালী?'

'একবার রাজা আমীরচাঁদজীর ওখানে যাও না। অসংখ্য লোককে তিনি প্রতিপালন করছেন—'

'ভেবে দেখি।'



'নইলে ফরাসডাঙাতেও যেতে পারো। সেখানে দেওয়ান রয়েছেন ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী, লক্ষ্মী তাঁর ঘরে বাঁধা; সব রাজা-মহারাজা তাঁর দুয়োরে গিয়ে হাত পাতে। কাউকে বিমুখ করেন না।'

ভারতচন্দ্র চুপ করে রইলেন। হাত পাতবার কথাটা তাঁর ভালো লাগল না।

দূর থেকে হুম-হাম করে পাল্‌কীর আওয়াজ আসছিল। ভট্‌চায্‌ বাড়ির সামনে এসে পাল্‌কীটা থামল। তারপরেই হেরম্বর দরাজ গলার হাঁক উঠল : 'দাদা, আমরা এসে গেছি।'

॥ তিন ॥

একটা মাস যেন স্বপ্নের মতো কেটে গেল।

নৌকোর ছইয়ের ভেতর চুপ করে বসে ছিলেন ভারতচন্দ্র। ভরা গঙ্গার কোল ঘেঁষে নৌকো চলেছে—বাঁধানো ঘাট দেখা দিচ্ছে—স্নান করছে মেয়ে-পুরুষ; কোথাও গঙ্গাযাত্রী ঘাটের ওপর শেষ নিঃশ্বাস টানছে—আঁজলা আঁজলা করে জল দেওয়া হচ্ছে তার মুখে, এমনিতে যদি সহজে না মরে, দম আটকেই ফুরিয়ে যাবে। আট-দশটি মেয়ে পাথরের মতো বসে আছে—পরনে টকটকে লাল পাড় শাড়ি, কপালে সিঁদুরের মাখামাখি। কোনো কুলীন স্বর্গে চললেন, এরা তাঁরই সহধর্মিণী। হয়তো সহমরণে যাবে কেউ কেউ।

দৃশ্যটা সহ্য করা যায় না—ভারতচন্দ্র চোখ ফিরিয়ে নিলেন। গঙ্গার ওপারে যতদূর চোখ যায় সবুজের পর সবুজ। পাহাড়ের মতো উঁচু একটা শিবমন্দির দেখা যায়, তার চুড়োর ওপর রুপোর ত্রিশূল রোদে জ্বলছে। একটা প্রকাণ্ড জাহাজ পালের পর পাল তুলে এগিয়ে চলে গেল উজানে। মাঝিরা বললে, ওলন্দাজের জাহাজ, হুগলীর বন্দরে চলল।

ওলন্দাজ, দিনেমার, ইংরেজ, ফরাসী। বন্দর করছে, কুঠি গড়ছে, ব্যবসা করছে। অচেনা মানুষ, অদ্ভুত ভাষা, অদ্ভুত চাল-চলন। ওই কালো প্রকাণ্ড জাহাজটার দিকে অনেকক্ষণ ধরে চেয়ে রইলেন ভারতচন্দ্র। কোথা থেকে একটা অশুভ সম্ভাবনার ছায়া ফেলতে লাগল মনের ভেতর। কী যেন একটা ঘটতে যাচ্ছে। উড়িষ্যা থেকে বর্গীর হাঙ্গামা এখন কমে এসেছে, বর্গী সেনাপতি ভাস্কর রাও পণ্ডিতকে কৌশলে হত্যা করে দেশে এখন অনেকটা শান্তি এনেছেন নবাব আলীবর্দী; কিন্তু নবাবের বয়েস বাড়ছে, ক্রমে অথর্ব হয়ে পড়ছেন আর হাতে ক্ষমতা পাচ্ছেন তাঁর দৌহিত্র মীর্জা মামুদ। মীর্জা মামুদের বয়েস অল্প, মাথা গরম, মতিগতি ভালো নয—শোনা যায় বিদেশীদেব, বিশেষ করে ইংরাজদের, সে দু' চক্ষে দেখতে পারে না। কিন্তু এইরকম কালো কালো জাহাজে আকাশছোঁয়া পাল তুলে যারা দুরন্ত সাগর পাড়ি দিয়ে এসেছে, আকাশের চাঁদের মতো যাদের রঙ, আগুনের মতো যাদের চুলের বর্ণ, চোখের তারা যাদের বাঘের মতো কপিশ, হাঁটবার সময় যাদের পায়ের দাপে মাটি কাঁপে আর তলোয়ার ঝন্‌ঝনিয়ে ওঠে, কথায় কথায় যাদের কামান গর্জায়—তাদের সঙ্গে বিরোধ করে কি শেষ পর্যন্ত ভালো হবে মীর্জা মামুদের?

কী একটা ঘটবে। কী একটা ঘটতে যাচ্ছে।

আবার গঙ্গার ঘাটে চোখ পড়ল। কোমরে পিতলের জলভরা কলসীটি নিয়ে, লাল শাড়িপরা একটি বধূ মাথার ঘোমটাটি একটু সরিয়ে কৌতূহলে তাঁরই নৌকোটির দিকে চেয়ে আছে। ভারতচন্দ্র চমকে উঠলেন। লীলা? না— মনের ভুল, লীলা অনেক দূরে, সারদা গ্রামে তার বাপের বাড়িতে। কথা দিয়ে এসেছেন, কোনো একটা রোজগারের উপায় করতে পারলেই তাকে নিয়ে আসবেন নিজের কাছে।

লীলা। সেই রাত। আঠারো বছর পরে স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ।

বাইরে দীঘির জলে জ্যোৎস্না। হাওয়ায় নিমফুলের গন্ধ। কুলুঙ্গিতে প্রদীপের শিখা। পাপিয়ার ডাকে রাত যেন বেদনায় মন্থর।

লাল শাড়ি। অলঙ্কারের শিঞ্জন। কপালে সিঁদুরের টীপ। দু' চোখে ভয়, আনন্দ আর ছলোছলো জল।

পায়ে লুটিয়ে প্রণাম করেছিলেন লীলা—পরম স্নেহে দু' হাতে তাঁকে তুলে ধরেছিলেন ভারতচন্দ্র।

'লীলা।'

ছলোছলো জল ধারা হয়ে নেমে এসেছিল।

'আমাকে ক্ষমা করো।'

'তোমার কোনো দোষ নেই। আমার ভাগ্য।'

'ভাগ্য নয়, লীলা।'—স্ত্রীর হাত ধরে এনে খাটে বসালেন, নিজেও বসলেন তাঁর পাশে। মুছিয়ে দিলেন চোখের জল। বললেন, 'যে অপদার্থ স্বামী স্ত্রীকে ভরণপোষণ করতে না পেরে কাপুরুষের মতো পালিয়ে যায়, আমি তাদেরই একজন। কিন্তু এবার আমি প্রায়শ্চিত্ত করব, ঘর বাঁধব তোমাকে নিয়ে।'

লীলা জবাব দেননি।

'কথা বলছ না যে?'

লীলা ঝাপসা চোখের দৃষ্টি তুলে ধরলেন স্বামীর দিকে। বললেন, 'তুমি তো ইচ্ছে করে আমার কাছে ফিরে আসোনি। এরা যদি জোর করে তোমাকে ধরে না রাখত, তুমি নিজে কখনো আমার কাছে আসতে না।'

এইবার চুপ করে থাকার পালা ভারতচন্দ্রের। কোনো কৈফিয়ৎ নেই তাঁর।

'তুমি তো আমাকে একেবারেই ভুলে গিয়েছিলে।'

'ভুলিনি লীলা। বারে বারে তোমার কথা ভেবেছি।'

'তাই আঠারো বছর ধরে আমার কোনো খবর পর্যন্ত নাওনি?'

'আমি যে দূর বিদেশে চলে গিয়েছিলুম। ভেবেছিলুম, গৃহসুখ আমার অদৃষ্টে নেই।'—ভারতচন্দ্র একটু চুপ করে রইলেন, বাইরে পাপিয়া ডাকছিল, দু'জনেই কান পেতে শুনলেন কিছুক্ষণ। তারপর আবার গম্ভীর গলায় ভারতচন্দ্র বললেন, 'সন্ন্যাসী হতে চেয়েছি, মনে বৈরাগ্য আনতে চেয়েছি,

ভাবতে চেয়েছি সংসারের বিষফলের প্রতি মোহ আমার দূর হোক, আমি কৃষ্ণপ্রেমের অমৃতরসেই ডুবে থাকব। কিন্তু কিছুই হয়নি লীলা। শুধু ভণ্ড সন্ন্যাসী সেজে, ভক্তির ভাণ করে ভক্তদের প্রতারণা করেছি।'

অশ্রুর কুয়াশা একটু একটু সরে গিয়ে লীলার কালো-নিবিড় চোখের তারা দুটো ধীরে ধীরে উজ্জ্বল হয়ে উঠতে লাগল। নিঃশব্দে স্বামীর দিকে চেয়ে রইলেন তিনি।

'এখন বুঝতে পারছি, তুমিই ছিলে আমার মনের ভেতর। বাধা সেইখানেই ছিল।'

'তা হলে আমিই তোমার ধর্মের পথে কাঁটা দিয়েছি?'

'না, লীলা। তুমিই আমার ধর্মরক্ষা করেছ।'

'তোমার কথা আমি বুঝতে পারছি না।'

'না বোঝবার তো কিছু নেই। তোমার ওপর অন্যায় করেছিলুম—স্বামীর কর্তব্য করিনি। তাই মহাপ্রভুও আমাকে ঠাঁই দিতে পারলেন না, পায়ে ঠেলে দিলেন।'

'তিনিও তো এমনি করেই বিষ্ণুপ্রিয়াকে কাঁদিয়ে চলে গিয়েছিলেন।'—জল ভরে এসেছিল লীলার চোখে: 'লোকের ঘর ভাঙাই তো তাঁর কাজ।'

ভারতচন্দ্র কিছুক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকেছিলেন স্ত্রীর মুখের দিকে। এ আর সেই ছোট্ট ফুটফুটে মেয়েটি নয়, দীর্ঘ আঠারো বছরের সংযমে শাসনে শান্ত মুখে একটা স্থির গাম্ভীর্য এসেছে, পড়েছে কঠিনতার ছাপ। এই আঠারো বছর ধরে আচার্য বাড়ির মেয়েটি সন্ন্যাসিনীর মতো গড়ে নিয়েছে নিজেকে, শাস্ত্র পড়েছে, একটা অনাসক্ত ভবিষ্যতের ভেতরে ভাসিয়ে দিয়েছে ভাগ্যকে। একবারের জন্য মনে হল, লীলার জীবনে তিনি ফিরে না এলেই ভালো করতেন; আজ তাঁর জন্যে লীলাকে আবার নতুন করে আরম্ভ করতে হবে; যে স্বামীকে এতদিন ধ্যানের মধ্যে পুজো করে এসেছেন, রক্তমাংসের একটা মানুষকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে সেখানে।

'আমি ফিরে এসে বোধহয় তোমার দুঃখই বাড়ালুম, লীলা।'

'পুরুষমানুষ বলেই এ-কথা বলতে পারলে। কিন্তু আমার একটা কথার জবাব দাওনি।'

'কোন্ কথার?'

'তোমার গৌরাঙ্গ তোমাকে পায়ে ঠেললেন কেন? তিনি তো মা বিষ্ণুপ্রিয়ার দিকে ফিরেও তাকাননি।'

'ও লক্ষ্মী-নারায়ণের কথা, লীলা। মানুষের মন নিয়ে ওঁদের বিচার করতে নেই। বারে বারে বিরহের মধ্য দিয়ে ওঁদের মিলন হয়—নইলে যে ওঁরা কেউ কাউকে পূর্ণ করে পান না।'

লীলা আবার চোখ তুললেন। ঘরের দরজাটা বোধহয় ভেজানো ছিল, একটা

দক্ষিণ হাওয়ার দমকায় কী করে খুলে গেল, দপ করে প্রদীপটা নিবে গেল হঠাৎ, আর কালকের মতো আজও খোলা দরজার পথ বেয়ে ঘরে জ্যোৎস্না এসে পড়ল। সেই জ্যোৎস্নায় লীলাকে অন্যরকম মনে হল, মুখের কঠিন শান্ত রেখাগুলো যেন তরল আর স্নিগ্ধ হয়ে গেল, হাওয়ায় নিম-মঞ্জরীর গন্ধ আসতে লাগল, পাপিয়ার ডাক উঠল, মনের ভেতর গুঞ্জন তুলল মহাজন-পদাবলীর সুর :

'বঁধু, কি আর বলিব আমি,
জীবনে মরণে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হইয়ো তুমি—'

দু' হাতে লীলাকে আরো কাছে জড়িয়ে এনে বললেন, 'আমরা তো দেবতা নই, লীলা। তাই নরলোকেই বিরহের পরে আমাদের নতুন করে মিলন হল।'

ভারতচন্দ্রের চমক ভাঙল।

'কর্তা, আমরা পেঁছে গেছি ফরাসডাঙায়। ওই তো কেল্লার ঘাট।'

মাঝির ডাকে ভারতচন্দ্র চেয়ে দেখলেন। আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে কেল্লার বুরুজ। গঙ্গার ধারে শাহী সড়কের পাশে রং-বেরঙের প্রাসাদের সার। মাঝগঙ্গায় দু'তিনটি অতিকায় জাহাজ। অসংখ্য নৌকোর ভিড়—সারি সারি কাপড়ের গাঁট নিয়ে নৌকোগুলো জাহাজে তুলছে। শয়ে শয়ে লোক—দোকান-পসার, মাঝখান দিয়ে মাটি কাঁপিয়ে চলেছে বিদেশীর দল—আকাশের চাঁদের মতো যাদের গায়ের রঙ, মাথার চুল যাদের আগুনবর্ণ, কোমরে যাদের তলোয়ার ঝনঝন করে বাজে।

স্তব্ধ হয়ে চেয়ে রইলেন ভারতচন্দ্র। এই পনেরো-ষোলো বছরের ভবঘুরে জীবনে অনেক দেশ, অনেক শহর দেখেছেন, কিন্তু এ যেন সম্পূর্ণ নতুন। এমন আশ্চর্য সুন্দর শহর, এত জমজমাট, এত মানুষ এক সঙ্গে—এ আর তিনি কখনো দেখেননি। নিজের চোখকে যেন বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করল না।

মাঝে আবার আঙুল বাড়িয়ে বললে, 'ওই যে বাজারের ভেতর রাজপ্রাসাদের মতন মস্ত বাড়ি দেখতে পাচ্ছেন—ওই হল ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর কাছারী। ফরাসীরা আর কী কর্তা, ফরাসডাঙার আসল মালিকই তো চৌধুরীমশাই—তিনিই হচ্ছেন এখানকার রাজা।'

অর্ধচন্দ্রাকার গঙ্গার ধারে শহর। তাই থেকে নাম চন্দ্রনগর। ফরাসী উচ্চারণে সাঁদের নাগর, লোকের মুখে মুখে চন্দননগর। আসলে সবাই ফরাস-ডাঙা বলেই জানে।

চন্দননগরের শাসনকর্তা জোসেফ ফ্রাঁসোয়া দ্যুপ্লে। দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী।

দ্যুপ্লে বুঝেছিলেন, এ দেশের রীতিনীতি তাঁদের জানা নেই, বিশেষ করে খাজনা-পত্র সংক্রান্ত আইন-কানুন তাঁরা কিছুই জানেন না। শহর গড়ে তোলা, অরলেয়াঁর কেল্লা রক্ষা করা আর কোম্পানির স্বার্থ—অ্যাঁদ্ অরিয়াঁতাল্-এর ব্যবসা যাতে ঠিক থাকে, প্রধানত সেইদিকেই তাঁদের লক্ষ্য রাখতে হবে। অতএব চন্দননগরের সবরকম স্থানীয় খাজনাপত্র আদায় করবার ভার পেলেন ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী—চুক্তি হল, মাসে হাজার টাকা করে অ্যাঁদ্ অরিয়াঁতালকে তিনি দেবেন।

ইন্দ্রনারায়ণের ভাগ্যের চাকা ঘুরে গেল।

তীক্ষ্নবুদ্ধি বিচক্ষণ ব্রাহ্মণ দেখতে দেখতে ফরাসডাঙার হর্তা-কর্তা-বিধাতা হয়ে বসলেন। বাজারে যা কিছু বিক্রী কিংবা আমদানি হয় তার ওপর তিনি খাজনা পান, ধান-চালের ওপর 'কোহালী' পান, কেউ কোনো স্থাবর সম্পত্তি কিনলে তাঁকে সেলামী দিতে হয়; কোনো বিয়ে-সাদী হলে বরপক্ষ থেকে দেড় টাকা আর কন্যাপক্ষ থেকে তিন টাকা প্রণামী তাঁর পাওনা; বন্দর বড়ো হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নৌকো তৈরীর কারখানা বসেছে, সেখান থেকে নৌকো কিনলে তাঁকে খাজনা দিতে হয়, তা ছাড়া প্রত্যেকটি জেলে ডিঙি এবং প্রতিটি হালের বলদের জন্যেও তিনি কর সংগ্রহ করেন। প্রতিটি ফরাসী কিংবা ইয়োরোপীয়ের জন্যে শতকরা চার টাকা আর দেশী লোকের জন্যে দশ টাকা রাজস্ব। চলতি নৌকোর ওপর সুদ, কোনো বিদেশী ফরাসডাঙায় বসবাস করতে এলে তার জন্যে ইচ্ছেমতো খাজনা। চারদিকে তাঁর তহশীল-দার ঘুরে বেড়ায়, লোক-লস্কর পাইক-বরকন্দাজে বিরাট কাছারীবাড়ি গমগম করে।

মাসে এক হাজার টাকা কোম্পানীর ঘরে পৌঁছে দিলেই নিশ্চিন্ত। সে টাকা তাঁর গায়েও লাগে না। লক্ষ্মী ঝাঁপি উজাড় করে ঢেলে দেন তাঁর ঘরে, ইন্দ্রনারায়ণের ঐশ্বর্য জনপ্রবাদে পরিণত, মুর্শিদাবাদের জগৎ শেঠ পর্যন্ত এই নতুন ভাগ্যবানের কাছে ম্লান হয়ে গেছেন।

দান-ধ্যান-অতিথিসেবাতেও তাঁর তুলনা নেই। কোনো প্রার্থী বিমুখ হয়ে ফেরে না। গঙ্গার ধারে গড়ে দিয়েছেন নন্দদুলালের অপরূপ মন্দির, পূজা-অর্চনায়, কীর্তনে মন্দির মুখর হয়ে থাকে। তাঁরই উদ্যোগে চন্দননগরে জগদ্ধাত্রী পূজার প্রচলন হয়েছে, সে পূজার সমারোহ দেখবার জন্যে দেশ-বিদেশ থেকে লোক ছুটে আসে।

শুধু সাধারণ মানুষই তাঁর দ্বারস্থ হয় তা নয়; বিপাকে পড়লে রাজা-মহারাজার দলও এসে দাঁড়ান ইন্দ্রনারায়ণের কাছে—লক্ষ লক্ষ টাকা ঋণ দিয়ে তিনি তাঁদের দায়মুক্ত করেন। ফরাসীদের তাঁর ওপর অগাধ আর অটল

বিশ্বাস, ইন্দ্রনারায়ণের কোনো কথায় স্বয়ং দ্যুপ্লে পর্যন্ত প্রতিবাদ করেন না।

গঙ্গার ধারে অপরূপ সুন্দর, ঐশ্বর্যে ঝলমল এই শহরের পথ ধরে ভারতচন্দ্র ভয়-ব্যাকুল পায়ে এগিয়ে চলেছেন। কোথাও সাজানো সব দোকান, ফরাসীরা সেখান থেকে কিনছে হাতির দাঁতের জিনিস, বেতের লাঠি, সোনা-রুপোর কারু-কাজ; ঘরে ঘরে তাঁত চলছে—রূপ পাচ্ছে সূক্ষ্ম মসলিন, মাকুর টানে টানে রঙ-বেরঙের সূক্ষ্ম সুতো যেন ইন্দ্রধনুর জাল বুনছে; কোথাও স্তূপাকার পাটের উগ্র গন্ধ—তৈরি হচ্ছে জাহাজ বাঁধবার বড়ো বড়ো কাছি; আর কোথাও ছুতোরের যন্ত্রে উঠছে ঠুক ঠুক আওয়াজ, পালিশ করা মেহগিনীর ওপর আশ্চর্য সব নকশা তুলছে শিল্পী।

শহর নয়—যেন ইন্দ্রলোক। আর সেই ইন্দ্রলোকের ইন্দ্র ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী স্বয়ং। সার্থক নাম।

ইন্দ্রনারায়ণের গদীতে ঢুকে দুরু দুরু বুকে দাঁড়িয়ে রইলেন ভারতচন্দ্র। প্রকাণ্ড ফরাসপাতা ঘর—মাথার ওপরে হাজার ডালের ঝাড় লণ্ঠনে এই দিনের বেলাতেই আলো জ্বলছে। দেওয়ালে ফরাসী সাহেবদের বড়ো বড়ো ছবি ঝুলছে কয়েকখানা। সেরেস্তায় হাত-বাক্স কোলে নিয়ে কর্মচারীরা হিসেব লিখছেন, মাঝখানে বিরাট তাকিয়ায় ঠেসান দিয়ে গড়গড়া টানছেন বৃদ্ধ ইন্দ্রনারায়ণ। কয়েকজন চাষাভুষো মানুষ হাত জোড় করে দরবার জানাচ্ছে তাঁকে।

একজন বলছে, 'সত্যি বলছি হুজুর, হালের বলদ আমার তিনটে। তশীল-দারেরা জোর করে বলছে, ছ'টা। ছিল বটে চারটে, কিন্তু একটা মড়কে মরে যাওয়ায়—'

সেই সময় ভারতচন্দ্র এসে সামনে দাঁড়ালেন।

চোখ তুলে ইন্দ্রনারায়ণ বললেন, 'আপনি?'

প্রণাম করে পায়ের ধুলো নিলেন ভারতচন্দ্র। বললেন, 'আমি আপনার শরণাগত।'

আশীর্বাদ করে ইন্দ্রনারায়ণ বললেন, 'কোত্থেকে আসছেন?'

'আমার বাড়ি ভুরশুট পরগণায়। পেঁড়ো বসন্তপুর।'

'জাতি?'

'ব্রাহ্মণ। ফুলের মুখুটি। উপাধি রায়।'

'কন্যাদায়? অর্থ সাহায্য দরকার?'

'আজ্ঞে না।'—ভারতচন্দ্র হাসলেন, 'পুত্র-কন্যা আমার নেই। আমি আপনার কাছে এসেছি কিছু কাজকর্মের সন্ধানে। দয়া করে একটা ব্যবস্থা করে দিন।'

'কোথায় আছেন এখানে?'

'আমি এইমাত্র এসে পেঁৗছেছি। আপনারই আশ্রয় চাই।'

ইন্দ্রনারায়ণ একবার ভ্রূকুঞ্চিত করলেন। বললেন, 'আমার অতিথিশালায়

আপনি স্বচ্ছন্দেই থাকতে পারেন। কিন্তু খাওয়ার ব্যবস্থা অন্যত্র করতে হবে। সে আমিই করে দেব।'

'কেন, আপনিও তো ব্রাহ্মণ। আপনার এখানে—'

ইন্দ্রনারায়ণ বিষণ্ণভাবে হাসলেন।

'আমার অন্ন গ্রহণ করলে ব্রাহ্মণ-সমাজে আপনি পতিত হবেন।'

'বলেন কি দেওয়ানজী!'—ভারতচন্দ্র আশ্চর্য হলেন : 'আপনাকে তুচ্ছ করে এমন শক্তি কার আছে?'

ইন্দ্রনারায়ণ তেমনি ম্লান গলায় বললেন, 'কেন, সমাজের। সে অনেক কথা, পরে শুনবেন। এখন এই পাইকের সঙ্গে যান, অতিথিশালায় আশ্রয় নিন—আপনার খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা আমি করছি। আর সন্ধ্যেবেলায় অন্যান্য কথা হবে আপনার সঙ্গে।'

সারি সারি ঘর অতিথিশালায়। দেশ-বিদেশের প্রার্থীর ভিড়। যে ঘরে ভারতচন্দ্র জায়গা পেলেন, সেখানে আরো দুজন আগে থেকেই জায়গা করে নিয়েছেন। চিঁড়ে, কলা, দই দিয়ে তাঁরা কাঁচা ফলারের আয়োজন করছিলেন।

দুজনেরই বয়েস হয়েছে, মাথায় কাঁচা-পাকা চুল, গিঁট বাঁধা টিকি, গলায় মোটা পৈতে। ভারতচন্দ্র নমস্কার করলেন তাঁদের।

একজন জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি?'

'ব্রাহ্মণ।'

পুঁটলিটি নামিয়ে এক কোণে বসে পড়লেন। ব্রাহ্মণদের একজন আঙুল বাড়িয়ে একটা মাদুর দেখিয়ে দিলেন। বললেন, 'ওটা নিতে পারেন।'

'এখন দরকার নেই, বেশ বসেছি।'

'আপনার অভিরুচি।'—ভ্রূকুটি করে ব্রাহ্মণ বললেন, 'আসা হচ্ছে কোত্থেকে?'

'পেঁড়ো বসন্তপুর।'

'সে কোথায়?'

'ভুরশুট পরগণায়।'

'অনেক দূর?'

'আজ্ঞে হাঁ, অনেক দূর।'

'ওঃ'—ব্রাহ্মণেরা ফলারে মন দিলেন। তারপর আবার প্রশ্ন হল : 'উপলক্ষ কী? কন্যাদায়? টোলের জন্যে সাহায্য? বৃত্তি?'

'আজ্ঞে না—উমেদারি।'—ভারতচন্দ্র হেসে ফেললেন।

'ওঃ—উমেদারি। তা হলে তো মশায়কে কিছুদিন থাকতে হবে এখানে।' ভারতচন্দ্র হাসলেন। বললেন, 'সেই রকমই তো ইচ্ছে আছে।'

'তা আহারাদি হবে কোথায়?'

তৎক্ষণাৎ ইন্দ্রনারায়ণের কথা মনে পড়ল ভারতচন্দ্রের। ঠিক এই রকমই কিসের একটা ইঙ্গিত দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু সে-কথা না তুলে ভালো-মানুষের মতো বললেন, 'কেন, চৌধুরী মশাইয়ের এখানেই হবে। এত মানুষকে যিনি আশ্রয় দেন, সাহায্য করেন, প্রতিপালন করেন, অতিথিকে দু মুঠো অন্ন তিনি দিতে পারবেন না?'

ব্রাহ্মণদের একজনের গলায় ফলার আটকে গেল, বিষম খেলেন তিনি। আর একজন চিঁড়ে-কলার গ্রাস মুখে তুলতে যাচ্ছিলেন, হাতসুদ্ধ সেটা নেমে এল কলাপাতার ওপরে।

যিনি বিষম খেলেন, একটা গোঁ গোঁ আওয়াজ বেরুল তাঁর মুখ দিয়ে। দ্বিতীয়জন রুক্ষস্বরে বললেন, 'মশাই কি সত্যি সত্যিই ব্রাহ্মণ?'

'আজ্ঞে, মুখোপাধ্যায়। কুলীন সন্তান।'

'জাত খোয়াবার ইচ্ছে হয়েছে?'

'কেন বলুন তো? আপনাদের কথা তো বুঝতে পারছি না।'

ব্রাহ্মণেরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন। বললেন, 'দুপুরবেলা এই যে চিঁড়ে-কলা গিলে মরছি, তাতেও কিছু মনে হচ্ছে না আপনার?'

'আজ্ঞে, খাওয়াটা তো মানুষের ইচ্ছাধীন। তা থেকে কী মনে হবে বলুন।'

'কিছু আপনি শোনেননি তা হলে?'

'আজ্ঞে না।'

'তবে দাঁড়ান, খাওয়াটা সেরে নিই, তারপরে বলছি। কিন্তু সাবধান, এর মধ্যে যদি চৌধুরী মশায়ের বাড়ি থেকে খেতে ডাকে, আপনি যাবেন না।'

ব্রাহ্মণেরা আবার আহারে মন দিলেন। ভারতচন্দ্র বসে রইলেন চুপ করে। চারদিকে মানুষের কলরব। কোথা থেকে আকাশ কাঁপিয়ে গুম গুম করে আওয়াজ উঠল, মনে হল, তোপ পড়ল কেল্লায়।

খাওয়া শেষ করে, বাইরে কলাপাতা ফেলে দিয়ে ব্রাহ্মণেরা ফিরে এলেন। একজন শোলা আর চকমকি বের করে তামাক ধরালেন, দ্বিতীয়জন গম্ভীর হয়ে ভারতচন্দ্রের মুখের দিকে তাকালেন। বললেন, 'এ ভারী আশ্চর্য ব্যাপার যে আপনি কিছু জানেন না। চৌধুরীমশাই পতিত।'

'কেন?'

'কেন আর? সেই বিদ্যেধরীর জন্যে।'

'বিদ্যেধরী?'—ভারতচন্দ্র আশ্চর্য হলেন: 'সে আবার কে?'

'আরে সে একটা ছোট জাতের মেয়ে—চৌধুরী মশাইয়ের সেবাদাসী। বিষ্ণু—বিষ্ণু! তা একটা কেন, দশটা সেবাদাসী রাখুন না—পয়সা আছে, যত খুশি পুষুন। কত লোকেই তো পুষছে। কিন্তু চৌধুরী মশায়ের কোনো চক্ষুলজ্জা নেই—একেবারে সকলের সামনে—রামচন্দ্র!'

'চৌধুরী মশায়ের তো সাহস আছে বলতে হবে।'

'কী বললেন?'—ব্রাহ্মণ চোখ পাকালেন।

'আজ্ঞে না, কিছু বলিনি—' ভারতচন্দ্র সন্ত্রস্ত হয়ে কথাটা সামলে নিলেন : 'বিদ্যাধরী কোথায় থাকে? ওঁর অন্দর মহলে নাকি?'

'আগে কোথায় থাকত জানি না, এখন তো নন্দদুলালের মন্দিরেই আছে। ঝাঁট-পাট দেয়, ঠাকুর সাজায়, চামর দোলায়, শুনেছি কেত্তন-টেত্তনও গাইতে পারে। বোষ্টুমদেরও বলিহারী মশাই—ওদের তো আর জাত-গোত্তর বিচার নেই'—ব্রাহ্মণ বিকট মুখভঙ্গি করলেন : "আচণ্ডালে ধরি দেই কোল!" ছত্রিশ জাতের ন্যাড়া-নেড়ীর মোচ্ছব হয় নন্দদুলালের মন্দিরে, সবাই নাকি বিদ্যাধরীকে মা বলে ডাকে। রামো—রামো!'

বৈষ্ণব-নিন্দা গায়ে লাগল, একবারের জন্যে মুখে এল : 'গোপনে পাপ করলে অপরাধ হয় না, আর সাহস করে মেয়েটিকে সামনে এনেছেন—তাকে সম্মান দিয়েছেন বলেই যত দোষ হল চৌধুরী মশাইয়ের? এই ভণ্ডামির নাম ধর্ম?' কিন্তু ভারতচন্দ্র কোনো প্রতিবাদ করলেন না।

শুধু একবার জিজ্ঞেস করলেন, 'তা চৌধুরী মশাই তো পতিত। ওঁর অন্ন খেলে জাত যায়, টাকা নিলে বুঝি জাতের ক্ষতি হয় না কিছু?'

'রজতখণ্ড চিরশুদ্ধ। তাতে অশুচিতা স্পর্শ করে না।'

'বিদ্যাধরীর হাত থেকে রজতখণ্ড নিতেও আপত্তি হবে না বোধহয়?'

ব্রাহ্মণ চটে উঠলেন : 'আমরা অশূদ্রযাজী। শূদ্রাণীর দান কেন নিতে যাব?'

ভারতচন্দ্র আরো কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, সেই সময় দরজার সামনে আবার পাইক এসে দাঁড়ালো। বললে, 'পেঁড়ো বসন্তপুর থেকে কে এসেছেন? কর্তা ডেকেছেন তাঁকে।'

ভারতচন্দ্র উঠে দাঁড়ালেন। পা বাড়ালেন ঘরের বাইরে।

পেছন থেকে ব্রাহ্মণদের জোরালো ফিসফিসানি শোনা গেল : 'খুব সাবধান মশাই, কক্ষনো অন্ন গ্রহণ করবেন না।'

ভারতচন্দ্র মুখ ফিরিয়ে হাসলেন। বললেন, 'ভাববেন না, আমার জাত সহজে যাবে না। তার বনেদ অনেক শক্ত।'

ব্রাহ্মণেরা আবার সন্দিগ্ধ চোখে ওঁর মুখের দিকে চাইলেন। ভারতচন্দ্রকে তাঁরা যেন সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারলেন না।

এবার আর কাছারীতে নয়—ইন্দ্রনারায়ণের খাসকামরায়।

এ ঘরটি খুব বড়ো নয়, কিন্তু ভেতরে পা দিয়েই চোখ ঝলসে যায়। হাঁটু পর্যন্ত ডুবে যায়, মেঝেতে এমনি পুরু মীর্জাপুরী গালিচা; রঙিন কাঁচের নানা রকম ঝাড়বাতি দুলছে ছাদ থেকে; দেওয়ালে বিদেশী ফিরিঙ্গিদের বড়ো বড়ো ছবি—অচেনা হরফে কী সব লেখা রয়েছে তাদের নীচে; আর ঘরময় মেহগিনী কাঠের ওপর নানা রকম সূক্ষ্ম কাজ করা গদী আঁটা সব বসবার জায়গা; ভারতচন্দ্র নিজে রাজবংশের ছেলে—ঐশ্বর্যের অভাব এক সময় তাঁদেরও

ছিল না; বর্ধমানের রাজপ্রাসাদ দেখেছেন, কটকে বর্গী সুবাদারের মহল দেখেছেন, কিন্তু এমন ধরনের আসবাব কোথাও তাঁর চোখে পড়েনি।

ঘরে ইন্দ্রনারায়ণ একা নন, তাঁর মুখোমুখি বসে একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক কথা কইছিলেন; মাথায় পাগড়ী, জরির কাজ করা পোশাক আর গলায় মুক্তোর মালা দেখে ভারতচন্দ্র বুঝলেন, ইনিও কোনো সম্ভ্রান্ত নামজাদা লোক।

ইন্দ্রনারায়ণ বললেন, 'আসুন রায় মশাই, আসুন।'

হাত জোড় করে ভারতচন্দ্র বললেন, 'আমাকে ভারত বলেই ডাকবেন। আমি আপনার আশ্রিত—বয়েসে পুত্রতুল্য।'

'আচ্ছা, তাই হবে—' ইন্দ্রনারায়ণ হাসলেন। বললেন, 'এই যে এঁকে দেখছ, ইনি হলেন বাবু রামেশ্বর মুখোপাধ্যায়—ওলন্দাজদের দেওয়ান। আমার বিশেষ বন্ধুব্যক্তি ইনি।'

ভারতচন্দ্র রামেশ্বরের পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করলেন। ইন্দ্রনারায়ণ বললেন, 'ইনি কাছেই গোঁদলপাড়ায় থাকেন। এঁর বাড়িতে তোমার খাওয়ার কথা বলেছি, ইনি আনন্দে রাজী হয়েছেন। তুমি আমার এখানে থেকে স্বচ্ছন্দে দুবেলা এঁর ওঁখানে খেয়ে আসতে পারো। আসতে যেতে একটু কষ্ট হবে হয়তো, তবে—'

ভারতচন্দ্র বললেন, 'আমার একটা নিবেদন আছে চৌধুরী মশাই।'

ইন্দ্রনারায়ণ বললেন, 'বলো।'

'আমি আপনার এখানেই প্রসাদ পেতে চাই।'

রামেশ্বর চমকে উঠলেন, তার চাইতে বেশি চমকালেন ইন্দ্রনারায়ণ স্বয়ং।

'কী বলছ হে? তুমি কি আমার সম্বন্ধে কিছুই জানো না?'

'আমি জানতে চাই না'—ভারতচন্দ্র দৃঢ়স্বরে বললেন, 'আঠারো বছর ধরে আমি দেশে দেশে ঘুরে বেড়িয়েছি, বারো বছর আমার কেটেছে পুরুষোত্তম ধামে। সেখানে জাত-বিচার নেই, শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথ কোনো ভেদ রাখেন না। লোকের কথা আমি গ্রাহ্য করি না।'

রামেশ্বরের মুখে মেঘের ছায়া পড়ল।

'বাপু হে, শ্রীক্ষেত্রে সব চলে। সেখানে চণ্ডাল এসে ব্রাহ্মণের মুখে অন্ন তুলে দেয়, লোকে বলে, "খাইয়া প্রসাদী ভাত, মাথায় মুছিবে হাত"—তীর্থ-মাহাত্ম্যে সব খণ্ডন হয়ে যায়। কিন্তু দেশ-গাঁয়ে তো আর ও-সব চলে না, সেখানে দেশাচার—লোকাচারকে মানতেই হয়।'

ইন্দ্রনারায়ণ বললেন, 'ঠিক কথা। তুমি কোনো দ্বিধা কোরো না ভারত, রামেশ্বরবাবুর সঙ্গেই চলে যাও। ইনি আমার ভাইয়ের মতো—এঁর অন্ন গ্রহণ করলে অতিথি-সেবার তৃপ্তি আমিই পাব।'

ভারতচন্দ্র আর একবার ইন্দ্রনারায়ণের পায়ের ধুলো মাথায় তুলে নিলেন।

॥ চার ॥

"ওহে বিনোদ রায় ধীরে ধীরে যাও হে।
অধরে মধুর হাসি বাঁশীটি বাজাও হে।
নবজলধরতনু শিখিপুচ্ছ শক্রধনু
পীত ধড়া বিজলীতে ময়ূরে নাচাও হে—"

চোখ বুজে গান শুনছিলেন ইন্দ্রনারায়ণ। হাত থেকে আস্তে গড়গড়ার নল খসে পড়ল তাঁর।

"নয়ন চকোর মোর দেখিয়া হয়েছে ভোর
মুখ সুধাকর হাসি সুধায় বাঁচাও হে—"

গান শেষ হল। ইন্দ্রনারায়ণ ধীরে ধীরে সোজা হয়ে উঠে বসলেন।

'এ গান তোমার নিজের লেখা?'

ভারতচন্দ্র সলজ্জভাবে মাথা নাড়লেন।

'তোমার মধ্যে যে মহাকবির প্রতিভা দেখতে পাচ্ছি। তুমি এইভাবে ভবঘুরে হয়ে তা নষ্ট করছ?'

'আজ্ঞে কী করব বলুন। আজকাল আর কে কবির পোষকতা করে!'

'ঠিক কথা, কেউ করে না।'—ইন্দ্রনারায়ণ একটু চুপ করে রইলেন : 'রাজা-রাজড়াদেরও সে মন আর নেই। দেশের অবস্থাও বদলে গেছে। এদিকে মুর্শিদাবাদে মীর্জা মামুদ, ওদিকে দিল্লীর গোলমাল, মোগল-বাদশাদের মস্‌নদ টলমল করছে—চারদিকে বর্গী-ঠ্যাঙাড়ে-ঠগী আর ডাকাতের উৎপাত। এখন আর কবির কথা কেউ ভাবে না, কিন্তু—' ইন্দ্রনারায়ণ আবার কী ভাবলেন, বললেন, 'না—সে হয় না।'

'কী হয় না চৌধুরী মশায়?'

'ভেবেছিলুম, ফরাসী সায়েবদের বলে তোমার একটা চাকরি করে দেব এখানে। কিন্তু তাতে কোনো লাভ নেই, তোমার কদর কেউ বুঝবে না, মাঝখান থেকে তোমার এমন কবিত্বশক্তিই নষ্ট হয়ে যাবে। আমার ছেলে কাশিম-বাজার কুঠির দেওয়ান হয়েছে, সেখানেও তোমাকে পাঠানো যেত। কিন্তু তার দরকার নেই।'

ভারতচন্দ্র ব্যাকুল হয়ে উঠলেন।

'কবিত্ব আছে বলে সেই অপরাধে আমায় কি না খেয়ে মরতে হবে চৌধুরী-মশাই?'

'না খেয়ে মরবে কেন? তোমার যোগ্য স্থান আমি তোমায় খুঁজে দেব।'

ভারতচন্দ্র চুপ করে রইলেন।

চাকর এসে গড়গড়ার তামাক বদলে দিয়ে গেল। ইন্দ্রনারায়ণ নলটা আবার মুখে তুলে নিলেন।

'আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না—না?'

'আজ্ঞে আপনি প্রতিপালক, আপনাকে অবিশ্বাস করব কেন? তবে অনেক-দিন হয়ে গেল কিনা—'

ইন্দ্রনারায়ণ হাসলেন।

'খুব অসুবিধে হচ্ছে?'

'আজ্ঞে বহুকাল বাড়িঘর ছেড়ে বিদেশে আছি কিনা। নইলে আপনি ইন্দ্রতুল্য, আপনার পায়ের কাছে পড়ে থাকা তো সৌভাগ্যের কথা।'

নিঃশব্দে কিছুক্ষণ তামাক টানলেন ইন্দ্রনারায়ণ। বললেন, 'আমার একজন খাতক আছেন। তিনি খুব রসিক আর গুণগ্রাহী, সংগীতে কাব্যে তাঁর গভীর অনুরাগ। শুনেছি, অনেক গুণী আছেন তাঁর সভায়। কিছুদিনের মধ্যেই আমার কাছে তিনি আসবেন খবর পেয়েছি। ভেবেছি, তাঁরই হাতে তোমায় তুলে দেব।'

'কে তিনি?'

'নবদ্বীপের অধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়।'

'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র?'

'চমকালে কেন? তাঁর নাম কি তুমি শোনোনি?'

'আজ্ঞে, শুনেছি বইকি।'—ভারতচন্দ্রের মুখ বিষণ্ন হয়ে উঠল: 'কিন্তু রাজা-মহারাজার কাছে যেতে আমার আর সাহস হয় না। আপনি ফরাসীদের ঘরেই যা হোক একটা কাজ জুটিয়ে দিন আমার।'

ইন্দ্রনারায়ণ আবার গড়গড়া টানতে লাগলেন, কপালে কয়েকটা চিন্তার রেখা ফুটল। বললেন, 'আজ প্রায় কুড়ি বছর ফরাসীদের সঙ্গে আছি আমি। সতেরো বছর ধরে ইজারাদারি করেছি। এর ভেতর ফরাসীদের ব্যবসা-বাণিজ্যের অনেক ওঠা-পড়া দেখেছি, দেখেছি দ্যুপ্লে সায়েব আসবার পরে ধীরে ধীরে কেমন করে শহর বাড়ল, বন্দরের উন্নতি হল, অরলেয়াঁর কেল্লা গড়ে উঠল। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে ঈশান কোণে ঝড় দেখা দেবে। ওদের দেশে ইংরেজ-ফরাসীতে গোলমাল চলছে—এখানে কখন যুদ্ধ বাধে ঠিক নেই। দিল্লীর বাদশা আহ্মদ শাহ্ তো অপদার্থ—শিখে আর বর্গীতে মিলে তচনচ কাণ্ড চলছে—কী যে হবে কিছুই বলা যায় না। সেইজন্যেই বলছি,

এখন এখানে থেকে কাজ নেই। যদি মেঘ কেটে যায়, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের ওখানে থাকতে তোমার ভালো না লাগে, চলে এসো আমার কাছে। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করব তখন।'

'তবু রাজা-মহারাজার কাছে—'

'এত ভয় কেন হে?'—ইন্দ্রনারায়ণ হাসলেন : 'বর্ধমানের অভিজ্ঞতা বুঝি কিছুতেই ভুলতে পারছ না?'

'আজ্ঞে, কয়েদখানায় তো প্রাণই যেতে বসেছিল। তারপরে আঠারো বছর বিবাগী হয়ে কাটাতে হল, এত সহজেই কি ভোলবার?'

'তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র সে-রকম লোক নন।'

'আপনি যা আদেশ দেবেন আমি তাই করব। কিন্তু কথাটা কী জানেন? ওঁদের কাউকেই আমার বিশ্বাস হয় না। "বড়র পীরিতি বালির বাঁধ, ক্ষণে হাতে দড়ি, ক্ষণেকে চাঁদ।"'

ইন্দ্রনারায়ণ চকিত হয়ে বললেন, 'বাঃ—বাঃ! মুখে মুখে বানালে নাকি হে?'

'আজ্ঞে, ছেলেবেলা থেকে ওই আমার রোগ।'

'রোগ নয় হে, যোগ। তুমি যোগী, সারস্বত-যোগী। সিদ্ধিলাভ তোমার হবেই—আমি ভবিষ্যদ্বাণী করছি।'

খোলা দরজায় ভারী চেহারার ছায়া পড়ল। মোটা গলায় অচেনা ভাষায় ডাক উঠল : 'আল্লো মসিয়ো শুদুরী!'[১]

ইন্দ্রনারায়ণ আসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন : 'আঁত্রে, আঁত্রে মসিয়ো দুবোয়া, সিল্ ভূ প্লে!'[২]

ফরাসী সাহেব ঘরে ঢুকল। একবার পিঙগল জিজ্ঞাসু চোখে চেয়ে দেখল ভারতচন্দ্রের দিকে। ইন্দ্রনারায়ণকে জিজ্ঞেস করল, 'ত্র্যাজকুপে?'[৩]

'পা দ্য তু। আসিয়ে ভূ।[৪] আচ্ছা ভারত, তুমি এসো এখন। দুবোয়া সাহেবের সঙ্গে আমার কথা আছে।'

ভারতচন্দ্র বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে, তারপর রাস্তায়। বাজারে গঞ্জে কতরকম মানুষের ভিড়। বন্দরে জাহাজ থেমে রয়েছে, মালবোঝাই নৌকো চলেছে তার দিকে।

কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী যাচ্ছে জাহাজে?'

'মস্‌লিন। বাপতা। মলমল। চাল। তুলো, মোম, শোরা—'

'কী নামে জাহাজ থেকে?'

---

১ হ্যালো শ্রীযুক্ত চৌধুরী!
২ আসুন, আসুন, মিঃ দুবোয়া—অনুগ্রহ করুন।
৩ খুব ব্যস্ত?
৪ আদৌ নয়। আপনি বসুন।

'শৌখিন বিলিতী থান। মদ। প্রবাল। লোহা-লক্কড়ের জিনিস—'

ভারতচন্দ্রের হাসি পেল। বিলিতী বানিয়ারা কত চালাক। নিয়ে যাচ্ছে চাল-তুলো, মস্‌লিন—তার বদলে আনছে সুরা। ওদের দোষ নেই। দিল্লীর বাদশারা যেদিন থেকে বিলিতী মদের স্বাদ পেয়েছে, সেদিন থেকেই দেশের জিনিসে আর তাদের নেশা লাগে না। জাহাঁগীর বাদ্‌শা তো বিলিতী মদ খেয়েই মরল। এখন রাজা-জমিদারেরাও ধরেছে। ওদের আর কী দোষ!

চারদিকে মানুষের কলরব। সব জমজমাট। কত ভাষায় কথা কইছে লোকে—বাংলা, ফার্সী, হিন্দী, ফরাসী; দোকানে বেচাকেনা চলছে। সবাই এখানে পয়সার জন্যে এসেছে—যেন ময়রার দোকানে উড়ে পড়েছে মাছির ঝাঁক।

শাহী শড়ক দিয়ে চলতে চলতে ভারতচন্দ্র থেমে দাঁড়ালেন। মানুষের সব কোলাহল, সব কেনা-বেচার হট্টগোল ছাপিয়ে শঙ্খঘণ্টার আওয়াজ উঠল। গঙ্গার জলে অন্ধকার নেমেছে, তার ওপর আরো ভারী হয়ে জমছে জাহাজ আর নৌকোর ছায়া, কয়েকটা আলো কাঁপছে স্রোতের সঙ্গে সঙ্গে। নন্দদুলালের মন্দিরে সন্ধ্যার আরতি শুরু হয়েছে।

মনে পড়ল বিদ্যাধরীর কথা।

এর ভেতরে কয়েকদিন তিনি মন্দিরে গেছেন, দূর থেকে মেয়েটিকে দেখেছেন কয়েকবার। বয়েস চল্লিশ ছাড়িয়ে আরো কিছুদূর এগিয়ে গেছে; শ্যামবর্ণ দীর্ঘ চেহারা। রূপসী নয়, কোথায় তবু একটা শান্ত শ্রী জড়িয়ে আছে শরীরে। দু হাতে দুটি কঙ্কণ ছাড়া আর কোনো আভরণ নেই, পরনে গরদের শাড়ি। দেখেছেন মন্দিরের সেবা করতে, আরতি সাজাতে, চামর দোলাতে। বাইরের লোকে যে যাই বলুক, বৈষ্ণবেরা তাকে শ্রদ্ধাভক্তি করে, তার হাত থেকে নন্দদুলালের প্রসাদ নেয়। বৈষ্ণবের শুচিবায়ু নেই, তাদের কাছে কৃষ্ণের জীব সব সমান।

এই মেয়েটির জন্যেই ইন্দ্রনারায়ণের লোকনিন্দা, সমাজে ধিক্কার, কোনো ব্রাহ্মণ অন্নগ্রহণ করেন না তাঁর বাড়িতে। অথচ তাঁর অতিথিশালায় দেশ-দেশান্তর থেকে এসে ভিড় করে, সামনে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে, তাঁর হাত থেকে সাহায্য নেয়, আশীর্বাদ করে, গদ্‌গদ হয়ে বলে, 'আপনি স্বয়ং দাতাকর্ণ! আপনার দর্শনলাভেও জীবন ধন্য হয়।'

হাত পেতে টাকা নিতে কারো লজ্জা নেই। রজত-কাঞ্চন? সে তো নিত্য-শুদ্ধ। তাতে কোনো পাপ স্পর্শ করে না।

ভণ্ডামি—মিথ্যার বেসাতি চারদিকে। ধর্ম একটা অভ্যাসমাত্র; শাস্ত্র শুধু কার্যসিদ্ধির জন্যে। সমস্ত জাতটার মেরুদণ্ডেই ঘুণ ধরে গেছে। ভারতচন্দ্র এই আঠারো বছর ধরে অনেক দেশ, অনেক মানুষকে দেখলেন। কোথায় বিশ্বাস—কোথায় ধর্ম? বর্গীর ভয়, চোর-ডাকাতের ভয়, দল-ছাড়া ফৌজের লুটতরাজের ভয়। আলীবর্দী ভাস্কর রাও পণ্ডিতকে মারলেন, রঘুজী নিজে

এসে চারদিকে শ্মশান করে দিয়ে গেলেন; দূর দক্ষিণের মানুষ মগ-ফিরিঙ্গির অত্যাচারে প্রায় পাগল। দিল্লীর মস্‌নদ থর-থর করে কাঁপছে। তবু আলীবর্দী যা পারেন করছেন, মীর্জা মামুদ সম্বন্ধে যে যাই বলুক, সেও তলোয়ার হাতে বীরের মতো নেমে পড়েছে। বর্গীর হাঙ্গামা একটু কমেছে, তবু সুবে বাংলায় শান্তি নেই, ভরসা নেই, এক মুহূর্তের জন্যে কারো সোয়াস্তি নেই। চণ্ডীর গানে কেউ আর আশ্বাস পায় না—মহাকালী এখন ডাকাতের দেবতা, কেশী-কংসনিসূদন তাঁর সুদর্শন চক্র রেখে বোধহয় ঘুমিয়েই পড়েছেন। এরই ফাঁকে ফাঁকে কাপালিকের হানা, নরবলি, পুকুরঘাট থেকে গৃহস্থের বৌ-ঝিকে ছিনিয়ে নেওয়া। আগে রাজা-জমিদারেরা প্রজাদের রক্ষা করতেন, এখন বর্গী আর ডাকাতের ভয়ে তাঁরা তটস্থ; ভয় ভোলবার জন্যে স্ফূর্তির স্রোতে তাঁরা গা ভাসিয়েছেন; চন্দননগর, কলকাতা, কাশিমবাজারের কুঠি থেকে আমদানি হচ্ছে বিলিতী মদ; দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, বারাণসী থেকে রূপো আর হাতির দাঁতের কাজ করা পাল্‌কীতে করে আসছে যবনী বাইজীর দল : 'যাবৎ জীবেৎ, সুখং জীবেৎ!'

আর এরই মাঝখানে ফিরিঙ্গি বানিয়ার দাপট। ধূর্ত ইংরাজ, বীর ফরাসী, ব্যবসায়ী ওলন্দাজ-দিনেমার, লুটেরা হার্মাদ। কী একটা ঘটবে—কী যেন ঘটতে যাচ্ছে।

বাইজী পুষলে রাজা-রাজড়ার জাত যায় না—মান বাড়ে; এক কুলীন চার-পাঁচশো বিয়ে করে উধাও হয়, সারাজীবনেও হয়তো তার পাত্তা মেলে না। মাঝে মাঝে এমন দু একটি কুলীন-সন্তানের জন্ম হয়, যাদের পিতৃপরিচয় খুঁজতে গেলে দক্ষযজ্ঞ বাধতে পারে!

আর যত দোষ ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর। কারণ, সাহস করে মেয়েটিকে সকলের সামনে স্বীকার করে নিয়েছেন তিনি।

ভারতচন্দ্র তো দেখেছেন মেয়েটিকে। সেই শ্যামবর্ণ, দীর্ঘ শরীরে পরিণত বয়সের কী স্নিগ্ধতাই ছড়িয়ে রয়েছে। যেন মনে হয় ভাদ্রের ভরা গঙ্গা, গভীর, শান্ত, নিজের ভেতরে নিমগ্ন। কয়েকটি পাকা চুল চকচক করছে সিঁথিতে। রূপ নয়, রূপের চাইতেও অনেক বেশি আছে তার, সে তার অন্তরের লাবণ্য। মুখে-চোখে জ্বলজ্বল করছে ভক্তিবিশ্বাস। এই মেয়েটিকে গ্রহণ না করে ইন্দ্রনারায়ণ যদি পাঁচটি যবনী আর আরমানী বাইজী রাখতেন, তা হলে কেউ এতটুকুও নিন্দা করত না; সবাই এক বাক্যে বলত : 'বেশ করেছেন, এ না হলে আর কিসের বড়লোক!'

ভণ্ডামি! চারদিকে দুর্দিনের ভেতরে এ ছাড়া কী আর আশা করা যায়!

আর এই রাজাদের একজনের সভায় গিয়ে তাঁকে বসতে হবে! উমেদারি করতে হবে, চাটুবাক্য শোনাতে হবে! নিজে রাজার ছেলে হয়েও বসতে হবে পারিষদের ভূমিকায়। দিনের পর দিন আত্মগ্লানিতে জ্বলে মরতে হবে, অথচ

প্রতিকারের কোনো উপায় থাকবে না!

তার চাইতে ইন্দ্রনারায়ণের উপাসনা বরং ভালো। সবদিক থেকে শ্রদ্ধা করবার মতো মানুষ তিনি। বীরপুরুষ ফরাসীদের তিনি হাতের মুঠোর মধ্যে রেখে দিয়েছেন। সারা ফরাসডাঙার সব খাজনার তিনি মালিক, অথচ কারো ওপর কোনো অন্যায় নেই, কোথাও কোনো জবরদস্তি চলে না; প্রত্যেকের নালিশ শোনেন, নিজে তার প্রতিকার করেন। চুলোয় যাক নবদ্বীপ, ফরাসী আর ইংরেজের গণ্ডগোলে যা হওয়ার তাই হোক, এখানেই তিনি থাকবেন। কী হবে কবিত্ব দিয়ে? আজকাল আর কবিকে কেউ চায় না; লোকের জন্যে বাইজী আছে, খেউড় গান আছে; তিনি ইন্দ্রনারায়ণের দোরগোড়াতেই পড়ে থাকবেন: 'যাচ্ঞা মোঘা বরমধিগুণে নাধমে লব্ধকামা—' মহতের কাছে ব্যর্থ উপাসনাও সম্মানজনক, অধমের কাছে প্রার্থনা পূর্ণ হলেও তা লজ্জাকর।

ভারতচন্দ্রের চিন্তায় ছেদ পড়ল।

নন্দদুলালের মন্দিরে ঢুকে কখন থেকে এক জায়গায় চুপ করে দাঁড়িয়ে রয়েছেন তিনি। আরতি শেষ হয়ে গেছে, সামনে একটি ছোট নাটকের অভিনয় শুরু হয়েছে; রাধা তাঁর সখীদের নিয়ে দই-দুধ বেচতে মথুরায় যাবেন, শ্রীকৃষ্ণ পথ আড়াল করে দাঁড়িয়েছেন। তাঁকে শুল্ক না দিয়ে গোপীরা মথুরার হাটে যেতে পারবে না। রাধা প্রশ্ন করছেন: 'কোন্ অধিকারে শুল্ক চাও তুমি? তোমাকে কি মহারাজ কংস নিয়োগ করেছেন?'

উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, 'আমি কংসকে গ্রাহ্যও করি না। আমার রাজা আমিই।'

শ্রীরাধা বলছেন, 'আমরা কংসের কাছে নালিশ করব। প্রহরীরা এসে এখনই তোমাকে বন্দী করে নিয়ে যাবে, রেখে দেবে পাষাণ কারাগারে, নানা নির্যাতন করবে, বুকের ওপর চাপিয়ে দেবে পাঁচ মণ পাথর। যদি প্রাণে বাঁচতে চাও, এখনি ভালোমানুষের মতো আমাদের পথ ছেড়ে দাও।'

শ্রীকৃষ্ণ হাসছেন। বলছেন, 'কংস? কে তাকে গ্রাহ্য করে? আমি পূতনা বধ করেছি, সংহার করেছি বক রাক্ষসকে, নিপাত করেছি কেশী দৈত্যকে, কালীদহের দুরন্ত কালীয় নাগকে দমন করে পদচিহ্ন এঁকে দিয়েছি তার ফণায়, এক ফুৎকারে বিনাশ করেছি তৃণাবর্তকে, ইন্দ্রের রোষ থেকে গোকুল বাঁচানোর জন্যে ছত্রাকারে ধারণ করেছি গিরি-গোবর্ধন। আর পাপ রাজা কংস? সে তো একটি মুষ্ট্যাঘাতের অপেক্ষামাত্র!'

রাধা বলছেন, 'হে বাক্যবাগীশ—'

ভারতচন্দ্রের কৌতুক বোধ হচ্ছিল। গানগুলো সুন্দর জমেছে; যে কিশোর ছেলেটি রাধা সেজেছে, সে রূপবান—তীক্ষ্ন আর উজ্জ্বল তার গলার স্বর।

শুধু শ্রীকৃষ্ণকেই যেন ঠিক মানায়নি। গানের গলা তার ভালো, কিন্তু একটু বয়েস হয়েছে, তা ছাড়া কিছু বেশিমাত্রায় আহারাদির ফলেই বোধহয় চেহারাটি একটু গোলগাল। এই কৃষ্ণ কেশী-কালীয় দমন করেছে, পরে কংস-শিশুপালের হন্তারক হবে, কুরুক্ষেত্রে পার্থ-সারথি হবে—রাধার আর দোষ কী, দর্শক ভারতচন্দ্রেরই সে-কথা বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হচ্ছে না।

'প্রসাদ নেবে বাবা?'

ভারতচন্দ্র চমকে উঠলেন। রুপোর থালা হাতে বিদ্যাধরী তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে। খোলা চুলের রাশ কোমর ছাপিয়ে নেমে পড়েছে, সর্বাঙ্গ থেকে চন্দনের মিষ্টি গন্ধ। দূর থেকে যাকে শান্ত-স্নিগ্ধ বলে মনে হয়েছিল, কাছে তাঁকে আরো পবিত্র, আরো দীপ্তাঙ্গী বলে মনে হল।

'দিন মা, দিন।'

অঞ্জলিপুটে হাত বাড়ালেন। বিদ্যাধরী দুটি সন্দেশ তুলে দিলেন তাঁর হাতে।

ভারতচন্দ্র এক মুহূর্ত চেয়ে রইলেন তাঁর দিকে। তারপর দু' হাতের সন্দেশ এক হাতে নিয়ে হঠাৎ নত হয়ে পড়লেন, প্রণাম করতে গেলেন বিদ্যাধরীকে।

সাপের ছোবল লাগতে যাচ্ছে, এমনিভাবে চমকে সরে গেলেন বিদ্যাধরী। হাতের থালাটা কেঁপে উঠল। 'ছি ছি বাবা, করছ কী তুমি?'

'আমি আপনার পায়ের ধুলো নেব, মা!'

'কী সর্বনাশ! আমি যে নিচু জাত বাবা! তার ওপর পাপীয়সী! এমন কথা শুনলেও যে আমি নরকে যাব।'

'না মা, আপনি বৈষ্ণবী। আপনাকে প্রণাম করলে পুণ্য হয়।'

'ছিঃ বাবা, ছিঃ। আমি কেউ নই—নন্দদুলালের দাসী। তাঁর চরণ ধরে পড়ে আছি, এক কণা কৃপা যদি কখনো পাই, এইটুকুই মাত্র ভরসা। এমনভাবে আমায় অপরাধী কোরো না।'

একটা কান্নার রেশ কেঁপে উঠল গলায়। বিদ্যাধরী সরে গেল সামনে থেকে।

ভারতচন্দ্র তেমনিভাবেই দাঁড়িয়ে রইলেন। এই মেয়েটির জন্যে ইন্দ্রনারায়ণ সমাজে পতিত। অথচ, পুরুষোত্তমের মন্দিরের পুরোহিত কিংবা শহরের অন্যান্য গণ্যমান্যদের পতিত করবার সাহস কেউ রাখে না। মন্দিরের দেব-দাসীদের নিয়ে সেখানে যে কী চলে, অন্তত ভারতচন্দ্রের তা অজানা নেই।

সামনে তখন শ্রীরাধা বলছেন: 'বেশ, শুল্কই না হয় দেব। কিন্তু কী দান তুমি চাও? কত কড়ি পেলে তুমি আমাদের পথ ছেড়ে দেবে?'

শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, 'কড়ি? অত তুচ্ছ জিনিসেই কি ভোলাতে পারো আমাকে?

আমার দাবি অনেক বেশি। তোমার যা শ্রেষ্ঠ দান, তাই দাও আমাকে। দাও তোমার লাজ-লজ্জা, বসন-ভূষণ, দাও তোমার জীবন-যৌবন—'

ধীরে ধীরে মন্দির থেকে বেরিয়ে এলেন ভারতচন্দ্র। দাবির পরিমাণ সামান্য নয়—যথাসর্বস্ব, জীবন-যৌবন! এমনি করেই সর্বস্ব সঁপে দিতে হয় ভক্তকে, এমন করে দিতে না জানলে মুক্তি আসে না। বিদ্যাধরী তাই দিয়েছেন। কিন্তু ক'জন দিতে পারে!

অন্যমনস্কভাবে আবার চললেন ভারতচন্দ্র। নদীর ধার ছেড়ে, বাজার পার হয়ে, অরলেয়াঁর কেল্লার পাশ ধরে এগিয়ে চললেন পূব-দক্ষিণে। ডান দিকে গীর্জা, পাদ্রীদের থাকবার জন্যে প্রাসাদ, তার পাশে ফরাসীদের আরোগ্যশালার মস্ত বাড়িটা। ভারতচন্দ্র ধীরে ধীরে এসে প্রকাণ্ড দীঘিটার বাঁধানো ঘাটলায় বসে পড়লেন। লোকে বলে, লালদীঘি। মস্ত দীঘি, পরিষ্কার নীল জল, আকাশে ছাড়া-ছাড়া মেঘের ভেতর দিয়ে ভাঙা চাঁদের আলো লাখ লাখ জোনাকির মতো সেই জলে ঝিকমিক করছে। সেই দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে মনে পড়ল খানাকুল-কৃষ্ণনগরের সেই দীঘির ধার, রঘুনাথের সেই বিশ্বাস-ঘাতকতা, মুকুন্দ ভট্‌চাযের সেই লোপাট্‌ করে নিয়ে যাওয়া—লীলা—

লীলা। একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল।

যতদিন ভুলে ছিলেন, দিন একরকম করে কাটছিল। ভেবেছিলেন, ঘর-সংসার তাঁর জন্যে নয়, তাঁকে ভগবান পৃথিবীর পথে পথে সন্ন্যাসী করেই ডাক পাঠিয়েছেন; কিন্তু সব এলোমেলো হয়ে গেল। সেই ঘরই আবার তাঁকে টানল, আঠারো বছর পরে স্ত্রীর সঙ্গে নতুন করে শুভদৃষ্টি হল, বুকের ভেতরে যেখানটা শূন্য হয়েছিল, সেখানে একটা রক্তমাংসের আকুলতা মাথা খুঁড়তে লাগল। লীলাকে কথা দিয়ে এসেছেন, সংসার বাঁধবেন।

কিন্তু কোথায় বাঁধবেন সংসার? কোন্‌ অনিশ্চয়তার ওপর? মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় কেমন লোক? সত্যি সত্যিই কি কবিকে শ্রদ্ধা করবেন তিনি, সম্মান দেবেন তাকে? না, নিজের চাটুকারদের দলেই আসন দিয়ে বসিয়ে রাখবেন?

ইন্দ্রনারায়ণ তাঁকে ভরসা দিয়েছেন। কিন্তু—

দুর্গের উঁচু বুরুজগুলো ভাঙা জ্যোৎস্নায় কেমন অশুভভাবে দাঁড়িয়ে। চোখে পড়লেই অকারণে চমক লাগে। বিদেশী বানিয়া। কলকাতা, চুঁচুড়ো, চন্দননগর, কাশিমবাজার—ক্রমাগত মনে হয়, কী একটা ঘটতে যাচ্ছে। কিন্তু কী ঘটবে?

মন্ত্র-উচ্চারণের মতো খানিকটা গম্ভীর স্বর কানে এল। লালদীঘির পেছনে খানিকটা দূরেই ক্রীশ্চানদের সমাধির জায়গা। কারা যেন একটা শবাধার বয়ে নিয়ে চলেছে সেদিকে, কয়েকটা বড়ো বড়ো আলো রয়েছে তাদের সঙ্গে।

মৃত্যু! সব দুর্ভাবনার জট একসঙ্গে খুলে দেয়। ভারতচন্দ্র অন্যমনস্ক

হলেন মুহূর্তের জন্যে। মনে পড়ল কার কবিতা :

"থা খোওয়াব মে' খিয়াল্ কো
তুঝ্ সে মু' আমল্,
জব আঁখ খুল্ গয়ী
ন জিয়ান থা ন সুদ্ থা—"

জীবন তো স্বপ্নের মরীচিকা। সুখই বা কী, দুঃখই বা কোথায়? মৃত্যুকে সাম্‌নে দেখলে এই সব মনে পড়ে বার বার। কিন্তু সত্যিই কি এ কথা ভাবতে পারেন ভারতচন্দ্র? এমন করে দেখতে পারেন সুখ-দুঃখকে, জীবনকে?

'ব'সোয়ার মসিয়ো!'

ভারতচন্দ্র চমকে উঠলেন। কখন একজন ফিরিঙ্গি এসে দাঁড়িয়েছে তার পাশে। ভাষা শুনেই বুঝতে পারলেন, ফরাসী। ইন্দ্রনারায়ণের বাড়িতে এই কথাটা তিনি অনেক বার শুনেছেন। সন্ধ্যাবেলা পরস্পরকে ওরা এই বলেই সম্ভাষণ করে।

ভারতচন্দ্র চেয়ে রইলেন লোকটির দিকে, কোনো জবাব দিলেন না। অস্বাভাবিক লম্বা রোগা চেহারা, মুখে ছুঁচালো দাড়ি, খালি মাথায় খানিকটা রুক্ষ ঝাঁকড়া চুল। তার ছায়াটা আরো দীর্ঘ হয়ে পড়েছে দীঘির জলে, চাঁদের আলো তার কপিল চোখ দুটোয় জ্বলে উঠছে।

চকিতের জন্যে মনে হল লোকটা যেন অশরীরী। এই সন্ধ্যায়, এই নির্জনতায় যেন ওদিকের কবরখানা থেকে সে উঠে এসেছে। লোকটি আবার বললে, 'পারদনে মোয়া। পার্লে ভূ ফ্রাঁসে?'

ভারতচন্দ্র মাথা নাড়লেন। তিনি বুঝতে পারছেন না।

লোকটি ধীরে ধীরে বললে, 'আমি ব্যাঁগালীজ ভালো বলতে পারি না। আপনাকে এখানে বসে থাকতে দেখে আলাপ করার ইচ্ছে হল। আমার নাম জাঁ। আপনার কাছে একটু বসব?'

'নিশ্চয়।'—আশ্চর্য হয়ে ভারতচন্দ্র বললেন, 'বসুন।'

'ম্যার্সি।' জাঁ তাঁর পাশে বসে পড়ল। ভারতচন্দ্র দেখলেন, লোকটির বয়েস হয়েছে, পাক ধরেছে মাথার চুলে, জ্যোৎস্নায় তার গালে-কপালে কয়েকটা কালো কালো রেখাও চোখ এড়াল না।

একটু চুপ করে থেকে জাঁ বললে, 'আপনি কে?'

'ব্রাহ্মণ।'

'ব্রামান? জ্য ক'প্রা—বুঝতে পেরেছি।—আপনি পুজা করেন?'

ভারতচন্দ্র একটু হাসলেন। নিজের পরিচয় লোকটির কাছে কী দেবেন, কিছুক্ষণ ভেবে পেলেন না। তারপর বললেন, 'না, পুজো করি না। আমি কবি। কবিতা লিখি।'

জাঁর চোখ যেন নতুন করে জ্বলে উঠল।

'পোয়্যাত্? কবি? ব' দিও! মহাশয়, আমারও তাই মনে হয়েছিল। পোয়্যাত্ না হলে কে আর এমন করে এখানে বসে থাকে?'

ভারতচন্দ্র বললেন, 'আপনিও কবি?'

'ন-ন! জ্য স্যুই অ্য' সল্দা—আমি একজন সল্দা—সৈনিক, যুদ্ধ করি। এখানে আছি কুড়ি বছর।'

'ও।'

লোকটি আবার অন্যমনস্ক হয়ে সামনের জ্যোৎস্না-জ্বলা জলের দিকে চেয়ে রইল। ভারতচন্দ্র ভাবছিলেন উঠবেন কিনা, এমন সময় জাঁ তাঁর মুখের দিকে তার দৃষ্টি ফেলল।

'জানেন, স্যাৎ নুই—আজকের রাত্রিতে, পনেরো বছর আগে মনামি আঁতোয়ান—আমার বন্ধু আঁতোয়ানকে আমি এখানে সমাধি দিয়ে গেছি। সেই থেকে আমি এই রাতে প্রতি বছর এখানে আসি, স্যুর তা ফস্—তার সমাধিতে ফুল দিই।'

'ও।'

'আপনি কবি, পোয়্যাত্। আপনি বুঝবেন। কেন সে মরেছিল, জানেন? পার্সক্য য়্যুন ব্যাঁগালী ফাম্—একটি বাঁগালী মেয়ের জন্য।'

'বাঙালী মেয়ের জন্যে?'

'উই-উই। স্য কি সে পাসে—কী হয়েছিল সব আপনাকে বলি। স্যাতেত্যুন পয়েজী—সেও একটা কবিতা। আপনি কবি, আপনাকে বলিতে ইচ্ছা করি।'

'বলুন।'

বাংলার সঙ্গে ছাড়া-ছাড়া ফরাসী মিশিয়ে জাঁ শুরু করল এক আশ্চর্য কাহিনী। চন্দননগরে যে সব ফরাসী সৈনিক আসত, তারা দেশীয় লোকের সঙ্গে মেলামেশা করত, ঘনিষ্ঠ হতো, শেষে এমনও হতো যে এদেশী মেয়েদের বিয়ে করে পালিয়ে যেত দূরে, তাদের নিয়ে সংসার বাঁধত।

এমনি করে কেল্লার সৈনিকের সংখ্যা কমে যাচ্ছে দেখে অ্যাঁদ্ অরিয়্যাঁতালের টনক নড়ল। তৈরী হল এক নিদারুণ 'লোয়া'—কঠোর আইন। সে আইনের সার কথা, কোনো সৈনিক যদি এদেশের মেয়েকে বিয়ে করে, তবে তার প্রাণদণ্ড হবে, সে অপরাধের কোনো ক্ষমা নেই।

'আর আমার বন্ধু—মার্সেল, মনে মনে সে-ও ছিল পোয়্যাত্। সল্দা—সৈনিক হওয়ার জন্যে তার জন্ম হয়নি। তবু আশ্চর্য দেশ এই অ্যাঁদের মোহই তাকে সাঁদের নাগরে টেনে এনেছিল। কী সুন্দর ছিল তার চেহারা। সোনালি চুল—নীল চোখ, কী চমৎকার গান গাইতে পারত। একজন ব্যাঁগালী মেয়েকে দেখে সে মুগ্ধ হয়ে গেল। মেয়েটির নাম ছিল কমলা।'

কৌতূহল গভীর হতে লাগল ভারতচন্দ্রের।

'তারপর!'

জাঁ বলে চলল কমলার রূপের কথা। ঘন কালো তার চুলের রাশ—সে যেন অন্ধকারের বনভূমি; তার চোখের দিকে তাকালে মনে হতো যেন 'ক্রেপ্‌স্‌কুল্'—গোধূলিতে পাশাপাশি দুটি সন্ধ্যাতারা ফুটেছে। 'সি ব্যাল্!' দেশ, জাতি, সমাজ—সব ভুলে গিয়ে সে-ও মার্সেলকে ভালোবাসল। দু জনে গভীর রাতে পালাতে চাইল সাঁদের নাগর ছেড়ে। কিন্তু পালাতে পারল না, গেটের সামনেই তারা ধরা পড়ল। পরদিন হল বিচার। মার্সেলের জন্যে হুকুম হল 'অ্য' কু দ্য ফো'—তাকে গুলি করে মারা হবে। জাঁর চোখ জলে ভরে উঠল : 'মার্সেল কবি ছিল। পোয়্যাত্। কিন্তু প্রাণ দিলে সে সল্‌দার মতো। মৃত্যুর আগে তাকে জিজ্ঞাসা করা হল, তুমি কি অনুতপ্ত? মার্সেল বললে, না। আমার হৃদয় জানে, ব' দিও জানেন—আমি কোনো অন্যায় করিনি। আর বুকে বন্দুকের গুলি বেঁধবার আগে পর্যন্ত সে গান গেয়েছিল। জানো, কী ছিল তার গানের কথা? সে বলেছিল, যতদিন আকাশে চন্দ্র-সূর্য থাকবে, ফুল ফুটবে, পাখি গান গাইবে—ততদিন বেঁচে থাকবে মানুষেব হৃদয়, বেঁচে থাকবে তার প্রেম। আমার মৃত্যু হবে, কিন্তু আমার প্রিয়াকে—আমার প্রেমকে কেউ কোনোদিন কেড়ে নিতে পারবে না।'—ফরাসী ভাষায় গুন গুন করে জাঁ কী বলে চলল, তার ভাষা ভারতচন্দ্র বুঝতে পারলেন না; কিন্তু এই জ্যোৎস্নায়, সামনের ওই সমাধি-গুলোর পটভূমিতে, নির্জনতায়, আর এই অদ্ভুত মানুষটির পাশে বসে পনেরো বছর আগেকার এক অপূর্ব কাহিনী শুনে, সব কিছুর অর্থই তাঁর কাছে যেন স্পষ্ট হয়ে গেল।

জাঁব ডাকে তাঁর চমক ভাঙল। সে বলছিল, 'তুমি কবি। এ নিয়ে একটা কবিতা লেখো।'

একটু চুপ করে থেকে ভারতচন্দ্র বললেন, 'লিখতে আমি পারি। কিন্তু সে কবিতা কেউ পড়বে না।'

জাঁ আহত হয়ে বললে, 'পুরকোয়া? কেন পড়বে না?'

ফিরিঙ্গি আব হিন্দু মেয়ের প্রেমের কাহিনী যে কেউ সহ্য করবে না, এ-কথা জাঁ-কে বলতে ভাবতচন্দ্রের বাধল। মার্সেলের মৃত্যুব ছবিটা যেন তাঁরও চোখের সামনে.ভাসছে। মনে পড়ছে, যতদিন আকাশে চন্দ্র-সূর্য থাকবে, তত-দিন বেঁচে থাকবে মানুষেব প্রেম। একটা নিঃশ্বাস ফেলে ভারতচন্দ্র বললেন, 'আমাদের দেশে মানুষের প্রেমের কথা নিয়ে কাব্য লেখার নিয়ম নেই। সব কিছু লিখতে হয় দেবতাকে নিয়ে।'

'কোয়া'?—জাঁ আরো ক্ষুণ্ণ হল : 'আমি তো তোমাদের রাদা-কিষণ্‌র গান শুনেছি। সে তো আমুর—প্রেমের গান!'

'কিন্তু রাধা-কৃষ্ণ দেবতা। তাঁদের প্রেম আমাদের ধর্মেরই কথা।'

'ও।' জাঁ হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো : 'তোমাদের কোনো হৃদয় নেই। তুমিও

পোয়্যাত্ নও। ন ন!'

ভারতচন্দ্র কিছু বলতে চাইলেন, বলতে পারলেন না। একটু পরে চোখ তুলে চেয়ে দেখলেন, জাঁ নেই। যেমন হঠাৎ এসেছিল, তেম্নি হঠাৎ কোথায় চলে গেছে লোকটা।

আশ্চর্য, পায়ের শব্দ পর্যন্ত শোনা গেল না। কিংবা নিজে অন্যমনস্ক ছিলেন বলেই—

আচ্ছা, লোকটা কি সত্যিই শরীরী? সে ওই কবরখানা থেকে উঠে আসেনি তো? কিংবা ও নিজেই মার্সেল, লালদীঘির এই নির্জনতায় ভারতচন্দ্রের কাছে এসে নিজের কাহিনীই জানিয়ে গেল, জানিয়ে গেল পনেরো বছর আগেকার এক গভীর করুণ ইতিহাস?

ছি-ছি, কী অসম্ভব অসংলগ্ন চিন্তা এ-সব!

আচ্ছা, কমলার কী হল, সে-কথা তো জাঁকে জিজ্ঞেস করা হল না।

কী হল কমলার? কে বলতে পারে সে-কথা? হয়তো এই লালদীঘির জলেই নিজের সব হিসেব মিটিয়ে দিয়েছিল সে। আর কী-ই বা করতে পারত এ-ছাড়া? সমাজ তো তাকে আর ফিরিয়ে নিত না।

আজ যদি মৃত্যুর ওপার থেকে কমলা সে কাহিনী বলতে আসে—

কেমন অস্বস্তি বোধ হল, আস্তে আস্তে উঠে পড়লেন ভারতচন্দ্র। মনে পড়ল, এখনো তাঁর সান্ধ্য-আহ্নিক কিছুই হয়নি, এই রাতে আবার তাঁকে খেতে যেতে হবে গোঁদলপাড়ার রামেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে।

জীবনটা আলো-অন্ধকারের এক অদ্ভুত কৌতুক! জাঁ, মার্সেল, কমলা—সবাই সেই কৌতুকের অংশীদার। তার মাঝখানে তাঁর নিজের জায়গাটা কোথায়, তা-ই শুধু বুঝতে পারছেন না।

॥ পাঁচ ॥

গঙ্গার ঘাটে স্নান করে উঠলেন ভারতচন্দ্র। তখন অল্প অল্প করে ফুটছে ভোরের আলো। শিব মন্দিরের পাশে পুরোনো বট গাছের তলায় তখনো এক টুকরো রাত জমে আছে, তার ডালে ডালে, কোটরে কোটরে শুরু হয়েছে পাখির কাকলী। তার তলা থেকে গম্ভীর ভরা গলায় ভৈরোঁতে শুরু হয়েছে ভজন : 'জয় হর শঙ্কর, জয় ভুবনেশ্বর, জয় মহাকাল-ত্রিপুরারি—'

সামনে গঙ্গায় নোঙর ফেলে ফিরিঙ্গী জাহাজগুলো স্তব্ধ; নৌকোর চলাচল এখনো আরম্ভ হয়নি। শুধু পাখির ডাক, পাতার শব্দ, আর ভজনের সঙ্গে সুর মিলিয়ে গঙ্গার করতালি। ভারতচন্দ্র চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। আকাশে সিঁদুর ছড়িয়ে, গঙ্গাকে রাঙিয়ে সূর্য উঠতে লাগল, ভারতচন্দ্রের মনে পড়ল, কতদিন নীলাচলে সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে সূর্যোদয় দেখেছেন তিনি!

'জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্'—

দু হাত তুলে সূর্য-প্রণাম করলেন ভারতচন্দ্র। তারপরেই শুনলেন, 'বাবা।'

শান্ত মধুর গলার স্বর। চেয়ে দেখলেন, সিঁড়ির দু ধাপ ওপরে বিদ্যাধরী দাঁড়িয়ে। পরনে গরদ, কপালে চন্দন। প্রথম সূর্যের আলোয় একখানা পটের মতো দেখালো।

ভারতচন্দ্র বললেন, 'আমাকে কিছু বলছেন মা?'

'একটা প্রার্থনা ছিল, বাবা।'

কয়েকদিন আগে নন্দদুলালের মন্দিরের স্মৃতিটা মনে এল। সেখানেও মেয়েটিকে যেমন দেখেছিলেন, এখানেও ঠিক তেম্‌নি দেখলেন। সেই শুচিতা, সেই পবিত্রতা। আশ্চর্য, এরই জন্যে চৌধুরী মশাইয়ের এত লোকনিন্দা!

'কী বলবেন, বলুন মা। আমি কি কিছু করতে পারি আপনার জন্যে?'

'পারো, বাবা। একটু অনুগ্রহ চাইছি তোমার কাছে।'

'অনুগ্রহ! আমি?'—বিস্মিত চোখে ভারতচন্দ্র চেয়ে রইলেন।

'বলতে সংকোচ হয় বাবা—' বিদ্যাধরী একবার থামল : 'আজকের সকালে ব্রাহ্মণকে কিছু ফলদান করে ধন্য হই আমি। কিন্তু সব ব্রাহ্মণ সে দান নেন না—আমি শূদ্রা আর পতিতা বলে—' বিদ্যাধরীর মুখে বেদনা আর লজ্জার ছায়া পড়ল : 'সেদিন মন্দিরে তোমার কথা শুনে বড়ো ভালো লেগেছিল। আজ তুমি গঙ্গায় স্নান করে উঠে আসছ ব্রাহ্মণ্যদেবের মতো, বড়ো ভালো

লাগল দেখে। লোভ আর সামলাতে পারলুম না। তোমার যদি আপত্তি না থাকে—'

ভারতচন্দ্র হাসলেন।

'মা, বহুকাল আমি বৈষ্ণব-সঙ্গ করেছি। আমার মন তৈরী হয়নি, বৈষ্ণব আমি হতেও পারিনি। কিন্তু কে শূদ্রা, কে পতিতা সে-বিচার শ্রীক্ষেত্রে গিয়েই আমি ভুলে গেছি। আমাকে কিছু দান করে যদি আপনার তৃপ্তি হয়, দিন।'

ছল ছল করে উঠল বিদ্যাধরীর চোখ, কিছুক্ষণ যেন কথা খুঁজে পেল না। তারপর আস্তে আস্তে বললে, 'তা হলে একটু কষ্ট করে এসো বাবা আমার সঙ্গে। মন্দিরের পাশেই আমি থাকি।'

ভারতচন্দ্র অনুসরণ করলেন বিদ্যাধরীকে। নন্দদুলালের মন্দিরের ধারেই বিদ্যাধরীর ঘর। টিনের চাল, কাঠের খুঁটি। দরজার শেকল খুলে বিদ্যাধরী বললে, 'এসো, বাবা।'

বারান্দায় খড়ম রেখে ভারতচন্দ্র ভেতরে ঢুকলেন। ছোট ঘরটির একদিকে মেজেতে একটি ছোট বিছানা গুটানো, বাকী আধখানা জুড়ে পুজোর সাজ-সরঞ্জাম, নিতাই-গৌরাঙ্গের পট, পিতলের বাল-গোপাল বসে আছেন রুপোর সিংহাসনে। ফুল রয়েছে সাজানো, ধূপের গন্ধে আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে ঘরটি। তারই পাশে একখানা বড়ো কাঁসার থালায় একটি নারকেল, এক ছড়া কলা, অন্যান্য দু-চারটি ফল, কিছু সন্দেশ, কয়েকটি টাকা।

একখানা আসন পেতে দিয়ে সসম্মানে বিদ্যাধরী বললেন, 'বোসো বাবা।'

ভারতচন্দ্র বসলেন। কাঁসার থালাখানি সামনে রেখে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল বিদ্যাধরী।

তটস্থ হয়ে ভারতচন্দ্র বললেন, 'কী করছেন মা, কী করছেন আপনি?'

'তুমি যে ব্রাহ্মণ, বাবা। তোমাকে প্রণাম করতে পেরে আজকের দিনটা আমার সার্থক হল।'

ব্রাহ্মণ! কথাটার গুণ আছে বটে। একটা বিস্বাদ হাসি ফুটে উঠল ভারত-চন্দ্রের মুখে। চন্দননগরে এসে ইন্দ্রনারায়ণের অতিথিশালায় ওঠবার দিনের সেই দুই ব্রাহ্মণকে তাঁর মনে পড়ে গেল।

বিদ্যাধরী বললে, 'তুমি থালাটা একবার স্পর্শ করো, বাবা। তা হলেই বুঝব, তুমি নিলে।'

দু হাত দিয়ে ভারতচন্দ্র থালাটি ধরলেন। বিদ্যাধরী বললে, 'তোমাকে আর কষ্ট করে বয়ে নিতে হবে না, আমি লোক দিয়ে পাঠিয়ে দেব। কোথায় থাকো তুমি?'

'চৌধুরী মশাই আমায় আশ্রয় দিয়েছেন। তাঁরই অতিথিশালায় থাকি।'

'খাওয়া-দাওয়া কোথায় হয়?'

ভারতচন্দ্র মাথা নামালেন। এই প্রসঙ্গটা না উঠলেই ভালো হতো। তাঁরই সামনে সন্ন্যাসীর মতো যে মেয়েটি বসে আছে, তারই জন্যে যে ইন্দ্রনারায়ণ ব্রাহ্মণকে অন্ন দিতে পারেন না, এ-কথা তাঁর আর অজানা নেই।

'গোঁদলপাড়ায় রামেশ্বর মুখুজ্জে মশাইয়ের বাড়ীতে।'

বিদ্যাধরীর মুখের ওপর দিয়ে ছায়া ভেসে গেল।

'আমি পাপীয়সী। আমার জন্যেই দেবতার মতো মানুষটির এত অপযশ।'

'একথা বলবেন না, মা। নিষ্পাপ শরীর আপনার। যারা আপনার নিন্দে করে, তারা মিথ্যেবাদী।'

বিদ্যাধরী আশ্চর্য হয়ে ভারতচন্দ্রের দিকে চেয়ে দেখল, বেদনায় ছল ছল করে উঠল তার চোখ। ঠিক এমন করে সান্ত্বনা এর আগে কেউ কখনো তাকে দেয়নি। আস্তে আস্তে বললে, 'বাবা, তুমি বিদেশী। আমার সম্বন্ধে কিছু জানো না বলেই এ-কথা বলছ।'

'আমি কিছু জানতে চাইনে, মা।'—ভারতচন্দ্রের গলায় আবেগ ফুটে উঠল : 'আপনাকে আমি দেখেছি।'

'কী দেখেছ বাবা বাইরে থেকে, কতটুকুই বা জানো।'—কয়েক মুহূর্ত বিদ্যাধরী চুপ করে রইল : 'মনে হয় তুমি সদ্‌বংশের সন্তান, তোমার চোখ-মুখ দেখে বুঝতে পারি, ঠিক সাধারণ মানুষ নও তুমি। আমাকে তুমি ভুল বুঝবে, এই ব্রতের পুণ্য দিনটিতে আমার সম্পর্কে মিথ্যে ধারণা নিয়ে যাবে, সে হয় না। নিজের কথা অল্পের মধ্যে তোমায় খুলে বলি। তোমার সময় নষ্ট করছি না তো বাবা?'

'আমার সময়ের কোনো অভাব নেই, মা।'

বিদ্যাধরী আবার কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। ধূপের ধোঁয়া ঘুরে ঘুরে একটা দূরের আড়াল তৈরী কবতে লাগল তার মুখের ওপব। গঙ্গার দিক থেকে অনেকগুলো দাঁড়ের আওয়াজ আসতে লাগল, কোনো একটা বড়ো নৌকো উজানে চলেছে।

: 'সে প্রায় কুড়ি বছর আগেকার কথা, বাবা। শ্বশুরবাড়ী থেকে বাপের বাড়ী আসছিলুম গোবুব গাড়ীতে। সঙ্গে স্বামী।'—বিদ্যাধরীব মুখ এতদিন পরেও লজ্জায় বেদনায় কালো হয়ে উঠল : 'পথে ডাকাতে ধরল মাঠের ভেতর। স্বামী পালালেন, সঙ্গের লোকজন পালালো। গয়না-গাঁটির সঙ্গে সব হারিয়ে মাঠের ভেতর পড়ে রইলুম অজ্ঞান হয়ে।

ভোর রাতে পাল্‌কী করে চলেছিলেন চৌধুরী মশাই। আমাকে কুড়িয়ে নিলেন। আমাব বাপের বাড়ীতে গেলেন। বাপ বেঁচে নেই, মা কেঁদে মাটি ভাসালেন, কিন্তু ভাইয়েরা দরজা আটকে রইল—ঘরে ঢুকতে দিলে না। শ্বশুরবাড়ী নিয়ে গেলেন, স্বামী কোন্ দিকে মুখ লুকোলো—শ্বশুর বললেন, ও বউ আর আমি ঘরে তুলতে পারব না। সমাজ আছে তো!

চৌধুরী মশাই বললেন, বেশ, দরকার হলে প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে নাও। আমি খরচ দেব।

শ্বশুর বললে, আপনি ফিরিঙ্গিদের সঙ্গে থাকেন। দেশের ধর্ম-কর্ম ভুলে গেছেন। এ পাপের কোনো প্রায়শ্চিত্তি নেই—পোকায় ছোঁয়া ফুল আর পুজোয় লাগে না। তা ছাড়া বউ বাঁজা। ছ'সাত বছর বিয়ে হয়েছে, এখনো ছেলেপুলে হল না। আমার বংশ থাকে কী করে? এ না হলেও ও বউকে আমি ত্যাগ করতুম।

সাফ জবাব।

চৌধুরী মশাইয়ের পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ে আমি বললুম, আপনি দয়ালু, আমার জন্যে আর মিথ্যে অপমান সইবেন না। আমার জন্যে দড়ি-কলসী আছে, গঙ্গার জল আছে, আপনি কিছু ভাববেন না।

তিনি বললেন, দড়ি-কলসীর কথা পরে হবে, এসো আমার সঙ্গে।

আনলেন, পায়ে ঠাঁই দিলেন। তখনো এত বড়ো হননি, সমাজে খুব হৈ হৈ হল, তবে ফিরিঙ্গিরা সহায় ছিল বলে বিশেষ কিছু কেউ করতে পারল না। আর আমি?'

বিদ্যাধরীর মুখ ধূপের রেখায় রেখায় যেন আরো অস্পষ্ট হয়ে গেল: 'আমারই মন নীচ, আমি থাকতে পারলুম না। পুজো করতে করতে ভালোবাসলুম। প্রথমটা চমকে উঠলেন, আমাকে ফেরাতে চাইলেন, কিন্তু আমি—'

বিদ্যাধরী থামল : 'আমারই পাপ বাবা, আমারই পাপ। ওঁর কোনো দোষ ছিল না। ওঁর গায়ে ধুলো লাগল, কিন্তু আমি পেলুম মুক্তি। ওঁকে ভালোবেসে ভালোবাসলুম নন্দদুলালকে। আজ রাতদিন ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করে বলি, আমার গতি হোক অনন্ত নরকে, কিন্তু ওঁর পুণ্যে যেন এতটুকুও কালির ছোঁয়া না লাগে।'

চোখে জল এসেছিল, শাড়ীর আঁচলে মুছে ফেলে বিদ্যাধরী বললে, 'এ-সব কথা কাউকে বলতে পারিনি, তোমাকে যে কেন বললুম তা-ও জানি না। মনে হল, তুমি ঠিক সাধারণ মানুষ নও। যখন গঙ্গাস্নান করে উঠে এলে, তখন তোমার সারা শরীর দিয়ে যেন আলো ঠিকরে পড়ছিল। তোমার নামটি কী, বাবা?'

'ভারতচন্দ্র রায়।'

'তুমি খুব বড়ো হবে, বাবা। ভগবান তোমার মুখে-চোখে সে-কথা লিখে দিয়েছেন।'

বিদ্যাধরীর কাহিনীটা মনের ভেতর ঘুরছিল। অন্যমনস্কভাবে বিষণ্ণ হাসি হাসলেন ভারতচন্দ্র। জীবনের এই চল্লিশটা বছর ধরে বড়ো হওয়ার সব লক্ষণই তো দেখতে পেলেন। কিন্তু এই রূঢ় কথাটা বিদ্যাধরীকে বলতে তাঁর বাধল।

'অনেকক্ষণ তোমায় আটকে রাখলুম বাবা, অপরাধ নিয়ো না। আচ্ছা, এসো তুমি। আমি এই থালাটা লোক দিয়ে অতিথিশালায় পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

'মা, আপনাকে আমার একটা প্রণাম করতে ইচ্ছে করছে!'

'ছিঃ বাবা, ছিঃ। এমন কথা শুনলেও আমার মহাপাতক।'

অতিথিশালার ঘরে ভারতচন্দ্র একা। কাল পর্যন্তও একজন সঙ্গী ছিলেন, তিনি মাতৃশ্রাদ্ধ বাবদ কিছু আদায় করে নিয়ে গেছেন ইন্দ্রনারায়ণের কাছ থেকে। যাওয়ার আগে ভারতচন্দ্রকে বলে গেছেন, 'মা মারা গেছেন মশাই বারো বছর আগে। বুঝলেম না—যেন তেন প্রকারেণ বর্বরস্য ধনক্ষয়ঃ!'

ভারতচন্দ্র জবাব দেননি।

এঁরা সমাজকে রক্ষা করছেন, এঁদেরই জন্যে তৈরী হচ্ছে স্বর্গের ধাপ। আর ইন্দ্রনারায়ণ পতিত। বিদ্যাধরীর পাঠিয়ে দেওয়া ফল-মিষ্টির দিকে চেয়ে রইলেন ভারতচন্দ্র। ঘরে আর কোনো ব্রাহ্মণ থাকলে এই থালাটা দেখে কী বলতেন, কে জানে!

নিজের ঝুলি থেকে একটি বই বের করলেন ভারতচন্দ্র। কতগুলো শাএরের সমষ্টি। পাতা ওল্টাতেই চোখে পড়ল :

> "খবরে-তহয়ুরে-ইশ্‌ক শুণ্ না জনুন্ রহা না পরী রহী,
> না তু তু রহা না তু মেঁ রহা যো রহী সো বে-খবরী রহী—"

প্রেমের শক্তি দেবভাব, দানবভাব, সব নিশ্চিহ্ন করে দিল। তোমার নিজত্ব—তোমার ব্যক্তিগত সত্তা—সব লুপ্ত হয়ে গিয়ে রইল শুধু একটি স্বার্থহীন একাত্মতার অনুভব।

ভারতচন্দ্র বই থেকে চোখ তুললেন। এ কা-র উপলব্ধি? বিদ্যাধরীর? প্রেমের আশ্চর্য শক্তি তাকেও কি এমনভাবে মুক্তি এনে দিয়েছে?

দরজার গোড়ায় ডাক পড়ল : 'রায় মশাই!'

চৌধুরী মশাইয়ের পাইক।

'রায় মশাই, হুজুর আপনাকে খাস্‌কামরায় ডেকেছেন।'

তটস্থ হয়ে ভারতচন্দ্র পুথি গুছিয়ে রাখলেন।

'আসছি, আমি এখনি আসছি।'

ভারতচন্দ্র ব্যস্ত হয়ে দেখা করতে গেলেন। সাধারণত এই সময় ইন্দ্র-নারায়ণ কখনো ডাকেন না, আজ নিশ্চয়ই কোনো জরুরি কাজের তাগিদ আছে।

খাস্‌কামরার সামনে আশা-সোঁটাধারী অচেনা প্রহরী। নিশ্চয় মান্যগণ্য কেউ এসেছেন। ভারতচন্দ্র দ্বিধা করতে লাগলেন। বরকন্দাজ বললে, 'যান, ভেতরে যান। হুজুর আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছেন।'

ভারতচন্দ্র দরজা ঠেলে সভয়ে ঢুকলেন ঘরের মধ্যে।

আজ ইন্দ্রনারায়ণের মুখোমুখি আর একজন রূপবান পুরুষ। বয়েসে ভারতচন্দ্রের কাছাকাছিই হবেন, কিছু কনিষ্ঠ হতেও বাধা নেই। কিন্তু ঐশ্বর্য আর আভিজাত্যের চিহ্ন তাঁর সর্বাঙ্গে। মাথার পাগড়ীতে হীরা, হাতের আঙুলের আংটিতে হীরা, গলায় তিন প্যাঁচ সোনার হারে হীরা-মুক্তোর কাজ। মস্‌লিনের দামী পোশাক, পায়ের মখমলের নাগরায় ঝকঝকে রুপোর জরি। ইন্দ্রনারায়ণকে বলছেন, 'আপাতত এই তিন লাখ টাকার ব্যবস্থা আমায় করে দিতেই হবে, নইলে মুর্শিদাবাদের রাজস্ব নিয়ে আমি খুব অসুবিধেয় পড়ব।'

ঠিক সেই সময় ভারতচন্দ্র পা দিলেন। আগন্তুক তার দিকে সন্দিগ্ধ চোখে চেয়েই থেমে গেলেন। আর ইন্দ্রনারায়ণ বললেন, 'এসো ভারত, এসো। ইনি হচ্ছেন নবদ্বীপের অধিপতি মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়। মহারাজ, এঁর কথাই আপনাকে বলছিলুম।'

কৃষ্ণচন্দ্র বললেন, 'ইনিই? বেশ-বেশ!'

ভারতচন্দ্র এগিয়ে গিয়ে মহারাজার পায়ের ধুলো নিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র বললেন, 'বসুন—বসুন।'

ভারতচন্দ্র বসলেন। তা হলে ইনিই তাঁর ভবিষ্যৎ প্রভু। প্রথম দৃষ্টিতেই মনে হল, লোকটি নেহাৎ খারাপ নন, চোখে-মুখে একটা প্রসন্নতার আভাস আছে, খুব সম্ভব রসিক আর ফুর্তিবাজ। কিন্তু কোথাও ব্যক্তিত্বের কোনো স্পষ্ট পরিচয় নেই, দুর্বলচিত্ত, মোটের ওপর একটা সহজ আরামের স্রোতে ভেসে যেতে ভালোবাসেন। এ ধরনের লোকের কাব্যরসিক হতে বাধা নেই, কিন্তু—

কিন্তু ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর আশ্রয় যদি বাঁধানো বটের ছায়া হয়. এর আশ্রয় প্রমোদ-বজরা।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র এক দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন ভারতচন্দ্রের দিকে। বললেন. 'আপনার সব কথা আমি চৌধুরী মশাইয়ের কাছ থেকে শুনেছি।'

'আমার সৌভাগ্য।'

'তা ছাড়া পেঁড়োর নরেন্দ্রনারায়ণের কথাও আমি জানি। মহারাণী বিষ্ণু-কুমারী তাঁর ওপরে যে অত্যাচার করেছিলেন, সে কথাও আমার শোনা আছে। বর্ধমানের ব্যাপারই ওই—তারা আর কাউকে মানুষ বলেই গণ্য করে না!'

ভারতচন্দ্র চুপ করে রইলেন।

ইন্দ্রনারায়ণ বললেন, 'ইনি যোগ্যবংশের যোগ্য সন্তান। সংস্কৃত জানেন, ফার্সী জানেন, অতি উচ্চশ্রেণীর কবিত্ব শক্তির অধিকারী। আপনি গুণিজনের প্রতিপালক, তাই আপনার সভাই এঁর যোগ্যস্থান বলে মনে করি। তাই এঁর জন্যে বিশেষভাবে আপনার কাছে সুপারিশ করেছি। এঁর স্বরচিত গান কিংবা

কবিতা শুনলে আপনি মুগ্ধ হবেন।'

কৃষ্ণচন্দ্র বললেন, 'সেইজন্যেই আমি আপনার প্রতি একটু আকর্ষণ বোধ করছি। আমার সভায় একটি ভাঁড় আছে, তার নাম গোপাল। সে অনর্গল ইয়ার্কি করতে পারে, রাতদিন বকবক করতে জানে। তাকে ছেড়ে যেমন আমার চলে না, তেমনি বেশিক্ষণ তার রসিকতা শুনলে মাথা ধরে যায়। এমনকি, আমার মহিষীরা পর্যন্ত তার বদ-রসিকতা থেকে নিস্তার পান না। এবার বড়োরাণী রাগ করে বলেছেন, "এসব ইতর-সঙ্গ করে তুমিও ইতর হয়ে যাচ্ছ।" আমি তাঁকে কথা দিয়েছি, "আমার সভায় এবার খুব গুণী একজন লোককে জোগাড় করে আনব।" একজন সুকবি যদি পাওয়া যায়, সে তো মহাভাগ্যের কথা!'

ইন্দ্রনারায়ণ আবার বললেন, 'ভারত সত্যিই সুকবি। এমন প্রতিভা আমি আর দেখিনি।'

'তাই নাকি?'—কৃষ্ণচন্দ্র গোঁফে একবার তা দিলেন। কৌতুকে চোখ দুটি মিটমিট করে উঠল তাঁর।

'আপনি সমস্যা-পূরণ করতে পারেন রায়মশাই?'

'সমস্যা-পূরণ?'

কৃষ্ণচন্দ্র হাসলেন : 'আকবর বাদশাহ যেমন করতেন। আধ পঙক্তি কবিতা বললেন, আর কোনো সভাসদ তা থেকে অর্থবোধক একটি সম্পূর্ণ কবিতা রচনা করে দিলেন।'

'বুঝেছি।'

'কবি যখন, আপনিও নিশ্চয় তা পারেন?'

তার অর্থ, কৃষ্ণচন্দ্র তাঁকে পরীক্ষা করতে চাইছেন। একবারের জন্যে ভারতচন্দ্রের চোখ জ্বলে উঠল। আবার মনে হল, 'যাচঞা মোঘা বরমধিগুণে নাধমে লব্ধকামা!' কিন্তু ইন্দ্রনারায়ণের সম্মান নির্ভর করছে তাঁর ওপর, তিনিই তাঁর জন্যে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করেছেন মহারাজাকে, তাঁর অমর্যাদা কিছুতে করা চলে না।

ভারতচন্দ্র মৃদুস্বরে বললেন, 'চেষ্টা করে দেখতে পারি।'

'খুব ভালো কথা।'—কৃষ্ণচন্দ্র একটু ভাবলেন, গোঁফে তা দিলেন একবার, একটুখানি কৌতুকের হাসি দেখা দিল ঠোঁটের কোণায়, বললেন, 'এইটে পূরণ করুন—"পায় পায় পায় না।"'

কয়েক মুহূর্ত নিঃশব্দে ভেবে নিলেন ভারতচন্দ্র। তারপর ধীরে ধীরে বলতে আরম্ভ করলেন :

'চিনিতে নারিনু আমি আইল জগৎস্বামী
মাগিল ত্রিপদ ভূমি আর কিছু চায় না,
খর্ব দেখি উপহাস শেষে একি সর্বনাশ
স্বর্গমর্ত্য দিব আশ তাহে মন ধায় না॥

গেল সকল সম্পদ এক্ষণে পরম পদ
বাকী আছে একপদ ঋণ শোধ যায় না।
হ্যাদে শুনে হৃদিপ্রিয়ে বৃন্দাদেবী দেখসিয়ে
অখিল ব্রহ্মাণ্ড দিয়ে পায় পায় পায় না।'

কবিতা শেষ করে ভারতচন্দ্র বললেন, 'এ হল বলিরাজার উক্তি। ত্রিপাদ ভূমি ভিক্ষা করে বামন-অবতার যখন তাঁকে ছলনা করেছিলেন, তখন।'

কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্র তখন অবাক মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে আছেন। ভারতচন্দ্রের শেষ কথাগুলো তিনি শুনতেও পেয়েছেন কিনা সন্দেহ। সত্যি সত্যিই যে ভারতচন্দ্র এত দ্রুত এমন সুন্দরভাবে সমস্যা পূরণ করে দেবেন, এ তাঁর কল্পনাতেও ছিল না।

শুধু অল্প অল্প হাসছিলেন ইন্দ্রনারায়ণ। বললেন, 'দেখুন মহারাজ, আমি ঠিক বলেছিলুম কিনা!'

কৃষ্ণচন্দ্র আসন ছেড়ে উঠলেন, দু পা এগিয়ে ভারতচন্দ্রের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। নিজের হাত থেকে খুললেন একটা হীরার আংটি, ভারতচন্দ্রের ডান হাতখানা টেনে নিয়ে আংটিটি পরিয়ে দিলেন তাঁর আঙুলে।

বললেন, 'সত্যিই আপনি মহাকবি। আপনাকে পেলে নবদ্বীপের রাজসভা ধন্য হবে।'

ভারতচন্দ্র আবার মহারাজের পায়ের ধুলো নিলেন। বললেন, 'আপনার অনুগ্রহ।'

'অনুগ্রহ নয়, আমার সৌভাগ্য। কিন্তু ক'দিন আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে এখানে। আমি আপাতত কলকাতায় চলেছি, কালীঘাটে মা-কে দর্শন করব, পুজো দেব। তাছাড়া মানিকচাঁদজী, আমীরচাঁদজীর সঙ্গেও কিছু বৈষয়িক কাজ-কারবার আছে। তা নইলে আমি নিজেই আপনাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতুম। আপনি এক কাজ করুন, তিন সপ্তাহ পরে কৃষ্ণনগরে গিয়ে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন, আমি আপনাকে সভাকবি করে রাখব।'

ইন্দ্রনারায়ণ সস্নেহে বললেন, 'ভারত, খুশি হয়েছ তো?'

ভারতচন্দ্র বললেন, 'এ কৃতজ্ঞতার ঋণ আমি সারা জীবনেও শোধ করতে পারব না।'

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র আর বেশিক্ষণ অপেক্ষা করলেন না। ইন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে আরো কিছু শিষ্টাচারের পালা শেষ করে, ভারতচন্দ্রকে আবার কৃষ্ণনগরে যাওয়ার জন্যে আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিলেন। আজই তাঁকে কলকাতা যেতে হবে।

কৃষ্ণচন্দ্র চলে গেলে ইন্দ্রনারায়ণ বললেন, 'কেমন দেখলে?'

করজোড়ে ভারতচন্দ্র বললেন, 'ভয়ে বলব না নির্ভয়ে বলব?'

চৌধুরী হাসলেন: 'নির্ভয়েই বলো।'

'বয়েস বেশি নয়, একটু তরলচিত্ত—'

চৌধুরী বললেন, 'ভুল বুঝেছ, বয়েসে তোমার চেয়ে বড়োই হবেন। তরল-চিত্ত বলছ? আদৌ নয়, অত্যন্ত বিচক্ষণ লোক। তুমি অনেকদিন বিদেশে ছিলে তাই হয়তো কিছুই জানো না। মহরোজা কৃষ্ণচন্দ্রই আজ দেশের কুলপতি—বলতে গেলে গঙ্গার পূর্বপাড়ের সমাজ তাঁর নির্দেশেই চলে। অনেক সৎকীর্তি করেছেন—দানেধ্যানে বহু খ্যাতি। মুর্শিদাবাদে নবাব আলীবর্দীও খুব খাতির করেন। তোমার ভয় নেই—যোগ্য স্থানেই তুমি আশ্রয় পাবে।'

মাথা নামিয়ে ভারতচন্দ্র ভাবতে লাগলেন।

'তা ছাড়া কী করবে এখানে থেকে? তোমাকে তো বলেছি, আবহাওয়া বড়ো ভালো ঠেকছে'না আমার। দুবোয়া কিছু দুঃসংবাদ দিয়ে গেল। ফরাসীরা বীরের জাত, কিন্তু ইংরেজ অনেক চালাক, অনেক ধুরন্ধর। কী যে ঘটবে সব অনিশ্চিত। তুমি চলেই যাও এখান থেকে। ভগবান তোমার ভালো করুন, সরস্বতী আশীর্বাদ করুন তোমাকে।'

॥ ছয় ॥

ধার্মিক, বুদ্ধিমান কৃষ্ণচন্দ্রকে আলীবর্দী আদর করে নাম দিয়েছেন 'ধর্মচন্দ্র'। চুরাশী পরগণা জুড়ে তাঁর রাজত্ব। রাজ্যের উত্তরসীমা মুর্শিদাবাদ, দক্ষিণসীমা গঙ্গাসাগর, পশ্চিমসীমা ভাগীরথী, পূব সীমান্ত 'বড় গঙ্গা'। 'চারি সমাজের' অধিনায়ক কৃষ্ণচন্দ্র। ঐশ্বর্যে, প্রতাপে বাংলা দেশে মাত্র দুজন তাঁর সমকক্ষ, একজন মুর্শিদাবাদের ধনপতি মহারাজ জগৎ শেঠ, আর একজন নাটোরের রাণী ভবানী।

বর্গীর হাঙ্গামা, প্রজাদের মধ্যে দুর্ভিক্ষ, মহাবৎজঙ্গের হাতে লাঞ্ছনা—এসব সত্ত্বেও মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র মোটের ওপর নিশ্চিন্তই ছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি কিছু অনিশ্চয়তার কারণ ঘটেছে। মুর্শিদাবাদের আকাশে মেঘ ঘনিয়ে আসছে। তার কারণ, নবাবের দৌহিত্র এবং পোষ্যপুত্র মীর্জা মামুদ। এ-কথা আজ আর গোপন নেই, জরাজীর্ণ বৃদ্ধ নবাব তাঁকেই বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার সিংহাসনে বসিয়ে যেতে চান।

নবাব আলীবর্দী অবশ্য চক্রান্ত আর হত্যার মধ্য দিয়েই সিংহাসনে বসেছিলেন। কিন্তু বীরত্বে, বিচক্ষণতায়, হিন্দু-মুসলমানের প্রতি সমান অপক্ষপাতে দেশের প্রত্যেক মানুষ শ্রদ্ধা করে তাঁকে; কৌশলে তিনি বর্গীর হাঙ্গামা ঠেকিয়েছেন; মগ-হার্মাদের উপদ্রব অনেকখানি বন্ধ করে দিয়েছেন। কিন্তু সব চাইতে বড়ো কথা, জমিদারদের সঙ্গে সব সময় তিনি সদ্ভাব রেখে চলেন, তাঁদের পরামর্শ ছাড়া কোনো কাজ করেন না। তিনি নবাব, কিন্তু ক্ষমতা প্রতিপত্তির চুড়োয় বসে আছেন ধনকুবের জগৎ শেঠ। তাঁরই প্রাসাদে নবাবী টাঁকশাল, তাঁরই কাছারীতে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার সব রাজস্ব জমা পড়ে। জগৎ শেঠই দেশের রাজা-জমিদারদের প্রতিনিধি—হাওয়া কখন কোন্-দিকে বইছে, সে খবর তিনিই ভালো করে জানেন।

এখন এই মীর্জা মামুদই জগৎ শেঠের কণ্টকশয্যা হয়ে উঠেছে।

উদ্ধত, বেপরোয়া, উচ্ছৃঙ্খল; কতগুলো কুসঙ্গী জুটেছে, তারাই আরো বেশি করে তার মাথা খাচ্ছে। তার লঘু-গুরু জ্ঞান নেই, এমনকি যে নবাবের সে চোখের মণি, তাঁরও বিরুদ্ধে একবার সে মাথা তুলেছিল। সুন্দরী মেয়েদের সম্পর্কে দুর্বলতার তার সীমা নেই; জগৎ শেঠের পুত্রবধূকে হরণ করে নিয়ে যে কীর্তি সে করেছে, মানী মানুষটার মাথা যে-ভাবে নুইয়ে দিয়েছে, তাতে শেঠজী ইহজীবনে তাকে ক্ষমা করতে পারবেন না। এমনকি তার উৎপাতে

স্বয়ং রাণী ভবানী পর্যন্ত বড়নগর ছেড়ে পালিয়ে এসেছেন।

বড়নগর গঙ্গার ধারে। গঙ্গাতীরে বাস করবার জন্যে নাটোরের মহারাণী একটি চমৎকার প্রাসাদ আর মন্দির তৈরী করিয়েছেন সেখানে। নিজের বিধবা মেয়ে তারাকে নিয়ে মধ্যে মধ্যে সেখানে এসে থাকেন। তারার অপূর্ব রূপ একদিন চোখে পড়ল মীর্জা মামুদের, তাকে পাওয়ার জন্যে সে পাগল হয়ে উঠল। রাণী অনেক কৌশলে মেয়েকে নিয়ে বড়নগর থেকে পালিয়ে গেলেন, কিন্তু এই ঘটনার পর থেকে লোকের হৃৎকম্প আরো বেশি করে দেখা দিয়েছে। জগৎ শেঠও যদি মান বাঁচাতে না পারেন, স্বয়ং রাণী ভবানীরই যদি এই অবস্থা হয়, তা হলে মীর্জা মামুদ বাংলার নবাব হলে কারো ঘরে বৌ-ঝি আর থাকবে না!

ভয়ের কারণ আরো আছে।

চতুর জগৎ শেঠ জানেন, ইংরেজ বণিকেরা ঠিক সাধারণ ব্যবসায়ীমাত্র নয়। ওদের বুদ্ধি আছে, শক্তি আছে, সাহস আছে। কিন্তু মীর্জা মামুদ দু' চোখে ইংরেজদের দেখতে পারে না, তার ধারণা, ইংরেজদের জন্যে চটিজুতোর কয়েকটা ঘা-ই যথেষ্ট। জগৎ শেঠ মনে করেন, এ আগুন নিয়ে খেলা—এর জের অনেকদূর পর্যন্ত গড়াবে।

শুধু একটিমাত্র উপায় আছে। নবাবের শরীর দিনের পর দিন যে-ভাবে ভেঙে পড়ছে, তাতে তাঁর সময় যে আর বেশি নেই, সে কথা নিশ্চিত। তারপরে মীর্জা মামুদই নবাব হয়ে বসবে। তখন যে দুর্দিন ঘনিয়ে আসবে, তার ছবিটা এখন থেকেই কল্পনা করা চলে।

এই সম্পর্কেই পরামর্শ করবার জন্যে মুর্শিদাবাদে একবার ডেকে পাঠিয়েছেন জগৎ শেঠ। জরুরি চিঠি নিয়ে লোক এসেছে—পড়তে পড়তে বার বার ভুরু কুঁচকে উঠছিল কৃষ্ণচন্দ্রের। চিঠির শেষে আর একটা দুঃসংবাদ আছে। হোসেনকুলী খাঁকে মুর্শিদাবাদের পথের ওপর দিনের আলোয় টুকরো টুকরো করে কেটেছে মীর্জা মামুদ। এমনকি হোসেনকুলীর অন্ধ ভাইটা পর্যন্ত নিস্তার পায়নি, তাকেও নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়েছে! নওয়াজেস্ মহম্মদ নীরব, আলীবর্দী একটি আঙুল পর্যন্তও তোলেননি।

হোসেনকুলীর মৃত্যুতে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই, নিজের মরণ অনেক দিন থেকেই সে ডাকছিল। কিন্তু মীর্জা মামুদ যদি এইভাবে সংক্ষেপে বিচার শেষ করতে শুরু করে দেয় নিজের হাতে, তাহলে এর শেষ কোথায়? এরপরে কার পালা আসবে? রাজবল্লভের? যে পাপে হোসেনকুলী প্রাণ হারিয়েছে —নিন্দুকে বলে তাতে রাজা রাজবল্লভেরও অংশ নিতান্ত কম নয়!

মহারাজের খাস কামরায় শুধু দেওয়ান গোপাল চক্রবর্তী ছাড়া আর কেউ ছিলেন না। কৃষ্ণচন্দ্র জিজ্ঞেস করলেন, 'কী করা যায় চক্রবর্তী?'

গোপাল কিছুক্ষণ ভাবলেন। তারপর বললেন, 'আমার পরামর্শ যদি

শোনেন, তাহলে এসব গণ্ডগোল থেকে যতটা পারা যায় দূরে থাকাই ভালো।'

'কিন্তু দূরে তো থাকা যাবে না চক্রবর্তী। এর সঙ্গে আমাদের সকলের স্বার্থই জড়িয়ে রয়েছে। বুড়ো নবাবের মনটা সরল, দুটো মিষ্টি কথাতেই গলে যায়। নইলে তুমি তো জানোঁ, নবাব সরকারে যে খাজনা আমরা দিই, আরো অনেক বেশি টাকা আমাদের ঘাড়ে ধরে আদায় করতে পারত। তোষামোদেই কার্যসিদ্ধি। কিন্তু মীর্জা মামুদ অন্য ধরনের লোক—বুকে পা দিয়ে পাওনা টাকা কেড়ে নিয়ে যাবে, মিঠে কথায় ভোলবার পাত্র সে নয়।'

'তবু তো সে-ই নবাব হবে দুদিন পরে। আজ যদি তার শত্রুতা করেন, ক্ষমতা হাতে পেলে সে আর ছেড়ে কথা কইবে? তখন শুধু টাকাই নয়, গলাটাও কেটে নেবে তার সঙ্গে।'

'নবাব যাতে না হয় তাই দেখতে হবে আমাদের।'

'কে হবে তার বদলে?'

'আমরা সবাই নওয়াজেস মহম্মদের কথা ভাবছি।'

'নওয়াজেস মহম্মদ?'

কৃষ্ণচন্দ্র ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন : 'হ্যাঁ, সেই যোগ্য লোক। ধীর, স্থির, মীর্জা মামুদের মতো হঠকারী নয়, বয়েস হয়েছে, বুদ্ধি বিবেচনা আছে। দানধ্যান করে, মতিঝিলে তার এতিমখানার দরজা সকলের জন্যে খোলা, সবাই তাকে পছন্দ করে। আর সব চেয়ে বড়ো কথা, সে আমাদেরই হাতে রয়েছে।'

'কিন্তু মহারাজ'—গোপাল চক্রবর্তী কুণ্ঠিতভাবে বললেন, 'নিজের বেগমকে পর্যন্ত যে শাসন করতে পারে না, সে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার ভার বইতে পারবে?'

কৃষ্ণচন্দ্র বিরক্ত হলেন। বললেন, 'সেইটেই তো আমাদের সুবিধে। আমরা ইচ্ছে মতো তাকে চালাতে পারব। আচ্ছা চক্রবর্তী, তুমি এখন যাও। পরে ভেবেচিন্তে শেঠজীর চিঠির জবাব দেওয়া যাবে।'

গোপাল চক্রবর্তী বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, কয়েক পা গিয়ে থেমে দাঁড়ালেন।

'মহারাজ ব্যস্ত ছিলেন বলে এতক্ষণ বলিনি। ফরাসডাঙা থেকে একজন ব্রাহ্মণ দেখা করতে এসেছেন আপনার সঙ্গে। বলছেন, চৌধুরী মশাই তাঁকে পাঠিয়েছেন।'

'কী নাম?'

'ভারতচন্দ্র রায়। মহারাজ নিজেই তাঁকে নাকি চরণ-দর্শনের আদেশ দিয়েছেন।'

কৃষ্ণচন্দ্র সোজা হয়ে বসলেন : 'আরে সেই কবি? কোথায় সে?'

'দরবারের বাইরে অপেক্ষা করছে।'

'ডেকে পাঠাও—এখুনি ডেকে পাঠাও। লোকটার জিভে সরস্বতী বাস করেন হে, মুখে মুখে কী আশ্চর্য কবিতা যে রচনা করতে পারে, সে আমি

তোমায় কী বলব। যাও, সঙ্গে করে নিয়ে এসো এখানে—'

গোপাল চক্রবর্তী চলে গেলেন।

দরবারের বাইরে একটি কাঞ্চন গাছের ছায়ায় ভারতচন্দ্র চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিলেন। হাওয়ায় একটি দুটি করে ফুল ঝরে পড়ছে গায়ে। সামনে দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে আসা-যাওয়া করছে ভোজপুরী আর বুন্দেলখণ্ডী সোয়ারের দল। তলোয়ার ঝনঝনিয়ে যাওয়া-আসা করছে কয়েকজন মোগল। দুজন ব্রাহ্মণ শাস্ত্র নিয়ে তর্ক করতে করতে চলে গেলেন। দেউড়িতে উঠছে নহবতের সুর। অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছেন ভারতচন্দ্র, এখনো রাজদর্শন হয়নি।

একটা তীক্ষ্ন অপমানের কাঁটা বুকের মধ্যে বিঁধতে লাগল। কৃষ্ণচন্দ্রের বিশাল পুরী, অনেক ঐশ্বর্য—তবু ইন্দ্রনারায়ণের তুলনায় কিছুই নয়। অথচ চৌধুরী মশায়ের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে কাউকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা এমন তীর্থের কাকের মতো অপেক্ষা করতে হয় না—তাঁর দরজা অবারিত। আর এ রাজা-মহারাজার কাণ্ড—এখানে অনুগ্রহ চাইতে হলে কুকুরেরও অধম হয়ে আসতে হয়!

মনে পড়তে লাগল, নিতান্ত হা-ঘরের সন্তান তিনিও নন—তাঁর বাপ নরেন্দ্রনারায়ণকেও লোকে রাজা বলত। কিন্তু গ্রহের ফের, সব অন্যরকম হয়ে গেল, তাঁকেও আজ আর এক রাজার দরবারে এসে দাঁড়াতে হচ্ছে উমেদারের ভূমিকায়। তিলে তিলে এখানে আত্মসম্মানকে বিসর্জন দিতে হবে, দিনের পর দিন অমানুষ হয়ে যেতে হবে। আরো দশজন ইতরের সঙ্গে গলা মিলিয়ে তাঁকেও মাছির মতো ভন্ ভন্ করে বলতে হবে: 'হাঁ মহারাজ, ঠিকই বলেছেন। সূর্য পশ্চিমে ওঠে, পুবে অস্ত যায়!'

ইন্দ্রনারায়ণের কাছেও তিনি উমেদার ছিলেন; কিন্তু সেখানে মনের এই দীনতা কোথাও ছিল না।

মহারাজ কি সত্যিই দেখা করবেন তাঁর সঙ্গে, না ধুলো পায়ে বিদায় নিতে হবে এখান থেকেই? ফরাসডাঙায় যে-সব সাধুবাদ শুনিয়ে কবিকে তিনি সভায় ডেকেছিলেন, সে-সব কি সত্যিই মনে আছে তাঁর? নাকি, গঙ্গার জলে বজরা ভাসানোর সঙ্গে সঙ্গেই সব কথা নিঃশেষে ভুলে গেছেন?

ভারতচন্দ্র দাঁতে দাঁত চাপলেন। হাতে সেই হীরের আংটিটা এখনো রয়েছে, যেন আগুনের মতো জ্বলতে লাগল সেটা। রঘুনাথ হতচ্ছাড়াই তাঁর সর্বনাশ করল। বেশ ছিলেন বৈষ্ণবের দলে—সে-ই কুবুদ্ধি করে—! কিন্তু আর ফেরা যায় না। লীলাকে নতুন করে দেখেছেন, কথা দিয়েছেন তাঁকে নিয়ে নতুন করে সংসার পাতবেন। কিন্তু—

'রায় মশায়!'

ভারতচন্দ্র চমকে ফিরে চাইলেন। এক সম্ভ্রান্ত চেহারার ভদ্রলোক সামনে দাঁড়িয়ে। কোনো পদস্থ রাজকর্মচারী বলে মনে হল।

ভদ্রলোক বললেন, 'আমি মহারাজের সুহবতী দেওয়ান। মহারাজ খাস-কামরায় এত্তেলা দিয়েছেন আপনাকে। আসুন আমার সঙ্গে।'

দরবার বসেছে পরদিন।

পাত্র-মিত্র নিয়ে সভা আলো করে বসেছেন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র। পণ্ডিত গদাধর তর্কালঙ্কার একটি নতুন শ্লোকে রাজাকে বন্দনা করতে শুরু করেছেন, এমন সময় বাইরে একটা হৈ-হৈ আওয়াজ উঠল।

সকলেই সেদিকে তাকালেন। দারোয়ানেরা মুচকে হেসে দরজা ছেড়ে দিলে। মাথায় একটি বিরাট ঝাঁকা নিয়ে কুঁজো হয়ে দরবারে ঢুকল একটি ঝাঁকামুটে, সারা গা দিয়ে তার দর দর করে ঘাম পড়ছে।

ঝাঁকার মধ্যে নিশ্চিন্তে বসে আছে ঘোর কালো রঙের গোলাকার একটি মনুষ্য। মুখভরা পরিতৃপ্তির হাসি।

সঙ্গে সঙ্গে সভায় কলধ্বনি উঠল : 'গোপাল ভাঁড়—গোপাল ভাঁড়।'

তিন চারজন চেঁচিয়ে বললে, 'এই মুটে, ফেলে দে, ঝাঁকাসুদ্ধ ফেলে দে ওটাকে।'

ঝাঁকা নামল, গোপাল ভাঁড় উঠে এল তা থেকে।

কৃষ্ণচন্দ্র হাসছিলেন।

'এটা কি হল গোপাল!'

'আজ্ঞে একটু নতুন রকমের হল'—বলে মহারাজকে প্রণাম করে অম্লান মুখে সভায় আসন নিলে গোপাল।

'তা হোক। এবার ও বেচারার ভাড়াটা মিটিয়ে দাও।'

'ভাড়া আবার কিসের মহারাজ? ওর মাথায় চেপে আমি এলুম, সেই ফাঁকে ব্যাটার রাজদর্শন হয়ে গেল, এই তো ওর সাতপুরুষের ভাগ্যি। ভাড়া চাইবে কোন্ আক্কেলে?'

লোকটা তখনো হাঁপাচ্ছিল। কৃষ্ণচন্দ্র বক্‌শীকে বললেন, 'লোকটাকে একটা টাকা দিয়ে দাও।'

মুটে চলে গেল। কৃষ্ণচন্দ্র বললেন, 'গোপাল, এ টাকা তোমার মাসোহারা থেকে কাটা যাবে।'

'তা যাক মহারাজ। কাল ওকে আবার আমিই ঝাঁকায় করে নিয়ে আসব। এক টাকা বক্‌শিশ মিলবে, উশুল হয়ে যাবে সব।'

'আচ্ছা, হয়েছে, থামো এখন।'

গদাধর তর্কালঙ্কার আবার দাঁড়িয়ে উঠে মহারাজার বন্দনা শেষ করলেন। সভায় কয়েকজন বললেন, 'সাধু-সাধু, অতি সুললিত রচনা।' গোপালের মন্তব্য শোনা গেল : 'অং-বং-কং!' গদাধর কেবল একবার ভ্রূকুটি করে

তাকালেন তার দিকে—কোনো জবাব দিলেন না।

ভারতচন্দ্র চুপ করে বসে ছিলেন এতক্ষণ। মহারাজ কালই আপ্যায়ন করে তাঁকে পারিষদরূপে নিয়োগ করেছেন, বেতন আপাতত চল্লিশ টাকা, প্রাসাদের কাছেই একটি বাসা এবং সিধেরও বন্দোবস্ত করে দিয়েছেন। এখন লীলাকে নিয়ে আসা যায়, সংসারযাত্রাও হয়তো একভাবে নির্বাহ করা চলে। কিন্তু এই মানুষগুলোর সঙ্গে থাকতে হবে তাঁকে? হাসতে হবে এই গোপাল ভাঁড়ের রসিকতায়? এরই মধ্যে কাটাতে হবে দিনের পর দিন? ভারতচন্দ্রের মুখে মেঘ ঘনিয়ে এল।

'ভারত।'

ভারতচন্দ্র চকিত হয়ে উঠলেন। মহারাজ তাঁকেই ডাকছেন। উঠে দাঁড়ালেন আসন ছেড়ে।

'ভারত, তোমাকে সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই'—একে একে পাত্র-মিত্র, আত্মীয়-কুটুম্বের নাম করে যেতে লাগলেন মহারাজা, তারপর বললেন, 'ইনি ভুরশুট্ রাজবংশের ছেলে ভারতচন্দ্র রায়। হিন্দী, ফার্সী, সংস্কৃত নানা ভাষায় পণ্ডিত। কিন্তু তার চাইতেও বড়ো পরিচয় এঁর আছে। ইনি অতি সুকবি। মুখে মুখে চমৎকার কবিতা রচনা করতে পারেন। আমি এঁকে সভাসদ নিযুক্ত করেছি।'

সভার সকলে বললেন, 'সাধু—সাধু।'

শুধু গোপাল প্রশ্ন করল, 'কী বললেন মহারাজ? সুকপি?'

'আঃ, গোপাল!'

গোপাল বললে, 'মহারাজ, আমার জিভে একটু দোষ আছে, ব আর প-এর উচ্চারণ সব সময়ে ঠিক থাকে না। ইনি নতুন লোক, দু-দিন পরেই সব বুঝতে পারবেন। তা ইনি যদি সত্যিই কপি, আমাদের দু-একটা কবিতা শোনাতে আজ্ঞা হোক।'

কৃষ্ণচন্দ্র হাসলেন।

'বেশ তো। কিছু তৈরী আছে ভারত? শোনাও এঁদের।'

মনের ভেতর স্তূপাকার বিতৃষ্ণাকে বিনীত হাসিতে পরিণত করলেন ভারতচন্দ্র, বৈষ্ণবদের সঙ্গে কাল কাটিয়ে অন্তত এটুকু লাভ তাঁর হয়েছে। মাথা নামিয়ে বললেন, 'কী কবিতা শোনাব মহারাজ? সংস্কৃত?'

গোপালই মাঝখান থেকে ফোড়ন কাটল : 'না মশাই, ও অং-বং-কং নয়। তর্কালঙ্কার মশাই, সিদ্ধান্ত মশাই দিনরাত ওসব শুনিয়ে শুনিয়ে মাথা খারাপ করে দিয়েছেন।'—গোপালের চোখ পিট পিট করে উঠল : 'আপনি তো অনেক ভাষা জানেন—না? হিন্দী—সম্স্কেত—ফার্সী? ঠিক আছে। সব ভাষায় মিলিয়েই আমাদের একটা কবিতা শোনান।'

মহারাজার পিসেমশাই শ্যামসুন্দর চাটুজ্জে আফিঙের নেশায় এই সকাল-

বেলাতেই অল্প অল্প ঝিমুচ্ছিলেন। এবার তিনি আরক্তিম চোখ দুটি মেলে একটা ধমক দিলেন গোপালকে।

'আঃ বড্ড বাড়াবাড়ি হচ্ছে, গোপাল। ইনি আজ প্রথম সভায় এসেছেন, কী ভাবছেন বলো দেখি।'

ভারতচন্দ্রের মুখের রেখাগুলো ক্রমশ শক্ত হয়ে উঠছিল। বললেন, 'আজ্ঞে না, আমি কিছুই ভাবিনি। আচ্ছা, চেষ্টা করা যাক। দেখি, উনি যেমনটা বলছেন, সে রকম পারা যায় কিনা।'

কৃষ্ণচন্দ্র বললেন, 'ওর পাগলামিতে কান দিয়ো না, ভারত। তুমি একটা বাংলা কবিতাই বলো।'

'মহারাজ, বাংলা কবিতা তো আছেই।'—ভারতচন্দ্র জোর করে হাসলেন : 'তা ইনি যখন নতুন রকম কিছু শুনতে চাইছেন, তখন এঁকেই বা একেবারে নিরাশ করি কেন! আমাকে একটু সময় দিন, চেষ্টা করে দেখি।'

কয়েক লহমা চোখ বুজে দাঁড়িয়ে রইলেন ভারতচন্দ্র। তারপর আরম্ভ করলেন :

'শ্যাম হিত প্রাণেশ্বর
বায়দ্‌কে গোয়দ্‌ রুবর
কাতর দেখে আদর কর
কাহে মর রো রোয়্‌কে।
বক্তুং বেদং চন্দ্রমা
ছুঃ লালা চে রেমা
ক্রোধিত পর দেও ক্ষমা
মেট্রিমে কাহে শোয়্‌কে।
যদি কিঞ্চিৎ ত্বং বদসি
দর্‌ জানে মন্‌ আয়ৎ খোসি
আমার হৃদয়ে বসি
প্রেম কর খোস্‌ হোয়কে—'

আর বলতে হল না। এক লাফে উঠে দাঁড়ালো গোপাল ভাঁড়।

'শাবাস—শাবাস—শাবাস। আর বলতে হবে না হে, এতেই আমাদের মাথায় কুমোরের চাকের চক্কর লাগিয়ে দিয়েছ! কী নিদারুণ কবিতাই শোনালে—যেন মনে হল, মগজের ভেতরে ভগবন্ত সিং গোটা কয়েক তোপ দাগল! পায়ের ধুলো দাও খুড়ো—পায়ের ধুলো দাও!'

একজন বললে, 'খুড়ো! খুড়ো আবার কোন্‌ সুবাদে হে গোপাল?'

'ভক্তির সুবাদে। কপি তো নয়—ইনি একেবারে মহাকপি জাম্বুবান। আমার জাম্বুবান খুড়ো।'

ভারতচন্দ্রের ঠোঁটের কোণে তীক্ষ্ন হাসির ঝলক ফুটে উঠল। বললেন, 'ভারী খুশি হলুম ভাইপো—জাম্বুবান খুড়োকে ঠিক চিনে নিয়েছ বলে। তা তোমার বাবা—দাদা হনুমান ভালো আছেন তো?'

রসিক গোপাল ভাঁড় একটা খাবি খেলো, সঙ্গে সঙ্গে যেন চুপসে গেল খানিকটা। আর হাসির রোল উঠল সভায়। সব চাইতে বেশি করে হাসলেন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র স্বয়ং।

রাজদরবারকে প্রথম চিনলেন ভারতচন্দ্র; দরবার চিনল ভারতচন্দ্রকে।

॥ সাত ॥

'জো রহীম উত্তম প্রকৃতি,
কা করি সকত কুসংগ,
চন্দন বিষ ব্যাপত নহী
লপটে রহত ভুজংগ—'

বাদশা আকবরের সভাসদ রহীম খান খানান আশ্বাস দিয়েছিলেন নিজেকে। আমার সত্যে আমি স্থির হয়ে থাকব—কে আমার চিত্ত-বিকার ঘটাতে পারে? রাজার সভা যেমনই হোক—আমি আত্মস্থ থাকব, আমি কবিতা লিখব, আমি সত্যিকারের রাজকবি হয়ে উঠব। "জো রহীম মন হাথ হ্যায়, তো তন কহু কিন জাহি—"

কিন্তু আত্মবিশ্বাস কিছুতেই থাকতে চায় না। একটা বিস্বাদ শূন্যতা ক্রমাগত মাথার ভেতরে ঘুরপাক খেতে থাকে।

দিনের পর দিন মহারাজার কৃপাদৃষ্টি বেশি করে পড়ছে ভারতচন্দ্রের ওপর। সকালে সন্ধ্যায় দুবেলা হুজুরে হাজির হতে হয়। সকালের দরবারে অনেক লোকের ভিড়ের মধ্যে বসে থাকতে হয় পারিষদের ভূমিকায়; সন্ধ্যায় ডাক পড়ে মহারাজের খাস-কামরায়—সেখানে বলরাম, হরষিত, শঙ্কর ইত্যাদি জনকয়েক অন্তরঙ্গ ছাড়া আর বিশেষ কেউ থাকে না। তখন নতুন নতুন কবিতা শোনাতে হয় মহারাজকে। গুরুগম্ভীর জিনিস মহারাজ পছন্দ করেন না। বলেন, 'এমনিতেই তো দুর্ভাবনার অন্ত নেই হে, তার ওপর আবার ও-সব ভারী ভারী ব্যাপার কেন? একটু হালকা ধরনের কিছু শোনাও—যাতে মন প্রসন্ন হয়।'

সুতরাং রাজার মন প্রসন্ন করতে হয়। তাতে কবিতা না হোক, ইয়ার্কির আবহাওয়াটা চমৎকার জমে ওঠে। ভারতচন্দ্র মধ্যে মধ্যে ভাবতে চেষ্টা করেন, আসলে তাঁর সঙ্গে গোপাল ভাঁড়ের তফাৎ কোথায়? দুজনে একই পথের যাত্রী—একই উপজীবিকা। দিনের পর দিন বুদ্ধি-বিদ্যা-মনুষ্যত্বের গণিকা-বৃত্তি। শেষ পর্যন্ত এই পরিণামই তিনি বেছে নিলেন?

ইন্দ্রনারায়ণকে মনে পড়ে। উমেদারী সেখানেও ছিল। কিন্তু কত তফাৎ।

মহারাজ সম্প্রতি ক'দিনের জন্যে মুর্শিদাবাদে গেছেন। আপাতত ছুটি। নিজের বাসাটিতে বসে ভারতচন্দ্র ভাবছিলেন, কী করা যায়। সামনের উঠোনে

মাধবীলতার কুঞ্জে দুটি টুনটুনি বাসা বাঁধবার চেষ্টা করছিল—ছোট ছোট গাছপালাতেই ওদের ঘর বাঁধার ঝোঁক। ভারতচন্দ্র লীলার কথা চিন্তা করছিলেন।

তাকে আনা যায় এখানে?

মাইনে যাই হোক, কষ্টেসৃষ্টে দিনযাপন হয়তো করা চলে। কিন্তু এই কৃষ্ণনগরে? যেখানে দিনের পর দিন ইয়ার্কি জমিয়ে রাজাকে খুশি রাখতে হয়, বলরাম-শঙ্কর-গোপাল ভাঁড়ের সঙ্গ দিতে হয়—সেখানে?

মন সাড়া দেয় না। কী বলবে তাঁকে লীলা? বলবে, 'তুমি বিদ্বান, তুমি কবি, শেষ পর্যন্ত এই রাস্তাই বেছে নিলে? তাহলে এত শাস্ত্র পড়বার কী দরকার ছিল? গোপাল ভাঁড়কে তো কিছুই পড়তে হয়নি, শুধু ইয়ার্কি দিয়েই সে রাজার চোখের মণি হয়ে উঠেছে!'

না, পারবেন না। লীলার কাছে এত ছোট হয়ে যাওয়া কল্পনাই করা চলে না।

টুনটুনি দুটো মাধবীলতার ঝোপে বাসা বাঁধছে—বেশ আছে ওরা। কবে ঘর বাঁধা হবে ভারতচন্দ্রের? ভবিষ্যতের দিকে একবার ছড়িয়ে দিলেন চোখের দৃষ্টি, কিছু দেখা যায় না—শুধু একরাশ শূন্যতা যেন হা-হা করছে সেখানে।

মনে পড়ল, আজ মাসোহারা নেবার দিন। একটা নিঃশ্বাস ফেলে উঠে পড়লেন। চাদরটা জড়িয়ে নিয়ে চললেন দেওয়ান রঘুনন্দন মিত্তিরের সদর কাছারীতে। এসব বিলি-ব্যবস্থা রঘুনন্দনই করেন।

পাইক-পেয়াদা লোক-লস্করে কাছারী জমজমাট। রাজজ্যোতিষী অনুকূল বাচস্পতি বেরিয়ে যাচ্ছিলেন কাছারী থেকে—একই উদ্দেশ্যে এসেছিলেন নিশ্চয়। ভারতচন্দ্রকে দেখে তাঁর কপালে ভ্রূকুটি ঘনিয়ে এল।

'প্রণাম বাচস্পতি মশাই।'

'জয় হোক।'—বিস্বাদ গলায় বাচস্পতি বললেন, 'ভালো তো?'

'আপনাদের আশীর্বাদে একরকম চলছে।'

'তা বেশ, বেশ।'—বাচস্পতি যাওয়ার জন্যে পাশ কাটালেন।

'দেওয়ানজী আছেন কাছারীতে?'

'আছেন—যাও।'—হাতের লাঠিটা ঠুক ঠুক করে বয়েসের তুলনায় অনেক বেশি দ্রুতগতিতে বাচস্পতি এগিয়ে গেলেন। কয়েক মুহূর্তের জন্যে উন্মনা হয়ে থেমে দাঁড়ালেন ভারতচন্দ্র। এই আর এক অস্বস্তি। ভারতচন্দ্র দিনের পর দিন অতি মাত্রায় রাজার প্রিয়পাত্র হয়ে উঠছেন এই ব্যাপারটাই এঁদের পক্ষে প্রায় অসহ্য। সভায় জ্ঞানী-গুণী-পণ্ডিত যাঁরা রয়েছেন, তাঁদের একটা চাপা অপ্রীতি মনের কাছে কখনো গোপন থাকে না। তিনি যেন হঠাৎ বাইরে থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসেছেন, যেন অন্যায়ভাবে এঁদের অধিকারে হাত বাড়িয়েছেন।

কথায় কথায় একদিন দুঃখ করেছিলেন রাজবৈদ্য গোবিন্দরাম রায়। তাঁর বাড়ি বাঙাল দেশে—যেখানে বিষ্ণুচক্রে সতীর নাসিকা ছিন্ন হয়ে পড়েছিল,

সেই সুগন্ধা তীর্থে। এ নিয়ে কবিরাজ মশায়ের মনে কিছু গর্বও আছে। কিন্তু বাঙাল বলে প্রতি মুহূর্তে তাঁকে নানান ঠাট্টা তামাসা সইতে হয়।

'অ কবিরাজ মশয়। অইদ্য কী বোজন অইলো? হুকুতা খাইছেন?'

বলরাম একদিন দরবারে বলেছিল, 'কবিরাজ মশায়ের ওষুধ মরা মানুষকে বাঁচায়, তাঁর আশীর্বাদে জ্যান্ত মানুষ মারা যায়।' কবিরাজের মুখ লাল হয়ে উঠেছিল : 'ক্যান্?'

'কেউ প্রণাম করলে বলবেন—শতায়ুর্ভব। কিন্তু বাঙালের মুখ দিয়ে তো আর শতায়ুঃ বেরুবে না, বেরুবে হতায়ুঃ! ব্যাস—গেল! এক আশীর্বাদেই ইহলোকের রাস্তা পরিষ্কার!'

কবিরাজ ক্ষোভ করে বলেছিলেন, 'মশয়, অ্যার্‌গো ব্যাবাক্ ভালো, ক্যাবল বাইরের মানুষ দ্যাখলেই হ্যারে কাউয়ার মত ঠোকরাইতে থাকে। ক্যান্—বাঙাল বলিয়া কি আমরা মনুষ্য না? নাকি বইন্যার জলেই আমরা ভাইস্যা আইছি?'

ভারতচন্দ্র বাঙাল নন, কিন্তু বিদেশী। তার ওপর মহারাজের বিশেষ অনুগ্রহভাজন। বিরক্তির কাঁটাগুলো বেশিক্ষণ লুকিয়ে থাকে না, যখন তখন আত্মপ্রকাশ করে। একটা নিশ্বাস ফেললেন ভারতচন্দ্র, তারপর কাছারীতে পা দিলেন।

রঘুনন্দন ডাকলেন, 'আসুন রায় মশায়, আসুন।'

ভারতচন্দ্র তাঁর পাশে ফরাসে গিয়ে বসলেন।

'আপনার মাসোহারা তো?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, সেইজন্যেই আসা।'

বাক্স খুলে রঘুনন্দন টাকা গুনতে লাগলেন। টাকা গোনা হলে আবার গুনলেন, নিশ্চিত হওয়ার জন্যে তৃতীয়বার গুনে দেখলেন। শেষে খাতা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'সই করুন'—

'শ্রীভারতচন্দ্র রায় দেবশর্মণঃ'—

টাকা নিয়ে উঠতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় বাইরে কোলাহল শোনা গেল। রঘুনন্দন মিত্তির চোখ তুলে তাকালেন উঠোনের দিকে, ভারতচন্দ্রের দৃষ্টিও পড়ল সঙ্গে সঙ্গে।

সিপাহীদের জমাদার মামুদ জাফর চিৎকার করে বলছে : 'চুপ রহো—চুপ রহো—সব বৈঠ্ যাও হিঁয়াপর। ফয়শালা পিছে হোগা।'

প্রায় ত্রিশ চল্লিশজন চাষী প্রজা। পনেরো-ষোলো বছরের কিশোর থেকে সত্তর বছরের বুড়ো পর্যন্ত আছে তাদের ভেতর। উদ্‌ভ্রান্ত চেহারা. বিবর্ণ মুখ, চোখভরা আতঙ্ক। অনেক দূর থেকে এসেছে মনে হয়, দু-একদিনের মধ্যে বিশেষ কিছু খেতে পেয়েছে বলেও বোধ হয় না। গা-ভর্তি ধুলো, দু-একজনের পা-টাও কেটে-ছড়ে গেছে, ধুলোর সঙ্গে জমে আছে কালো কালো

রক্তের বিন্দু। লোকগুলো হাঁপাচ্ছে।

শুধু ওইটুকুই নয়। দড়ি দিয়ে তাদের হাত শক্ত করে বাঁধা। একদল পাইক লাঠি হাতে ঘিরে আছে তাদের।

কে যেন ভাঙা গলায় বলতে চাইল : 'একটু জল—'

মামুদ জাফর উঠোন কাঁপিয়ে ধমক দিলে : 'ঠহ্‌রো উল্লুকা বাচ্চা!'

কিছুক্ষণ নির্বাক দৃষ্টিতে ভারতচন্দ্র চেয়ে রইলেন লোকগুলোর দিকে।

'এরা কারা দেওয়ানজী?'

রঘুনন্দন বললেন, 'ধাড়ী বজ্জাত সব।'

'বজ্জাত কেন?'

'অবাধ্য প্রজা।'

'অবাধ্য? কই—দেখে তো সে রকম মনে হয় না।'

'তা মনে হবে কেন?'—রঘুনন্দন মুখভঙ্গি করলেন : 'বাইরে থেকে যত সাদাসিধে সরল দেখছেন, ভেতরে ভেতরে আদৌ তা নয়। গেঁয়ো চাষী কিনা, চেহারায় তাই নিপাট ভালো মানুষ, আসলে ব্যাটারা শয়তানের একশেষ।'

'কী করেছে বলুন তো?'—লোকগুলোর ক্ষুধিত ক্লান্ত মুখের দিকে চেয়ে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হল না।

'কী আবার করবে?'—ভ্রূকুটি করে রঘুনন্দন বললেন, 'গ্রামসুদ্ধ লোক এককাট্টা হয়েছে। বলে, সরকারী খাজনা দেবে না।'

'খাজনা দেবে না কেন?'

রঘুনন্দন মিত্তির কঠিন হাসি হাসলেন : 'এত পুঁথি-পত্তর পড়েছেন মশায়, দুরাত্মার ছলের অভাব হয় না, একথা কখনো শোনেননি? এরা বলছে, বর্গীর হাঙ্গামায় সর্বস্বান্ত হয়ে গেছে, খাজনা দিতে পারবে না।'

'বর্গীর হাঙ্গামা তো এখন দেশে নেই।'

'তা নেই। কিন্তু এরা বলছে, মারাত্মক অতিবৃষ্টি হয়েছে এ-বছর। যা ফসল ক্ষেতে ছিল, হেজে নষ্ট হয়ে গেছে। গতবারও চাষ হয়ই নি বলতে গেলে।

ভারতচন্দ্র বললেন, 'কথাগুলো তো মিথ্যে নয়?'

'আপনি বিশ্বাস করেন নাকি? কবিমানুষ মশায় আপনারা—' রঘুনন্দনের স্বর বিষাক্ত হয়ে উঠল : 'একটুতেই মন গলে যায় আপনাদের। আপনাদের মতো সাদাসিধে হলে কি আর জমিদারী করা চলত, সব লাটে উঠে যেত কোনদিন। আচ্ছা, আপনিই বলুন তো—চেহারা দেখে মনে হয় ব্যাটারা কচু-ঘেঁচু খেয়েই বেঁচে রয়েছে?'

রাজভোগ খেয়ে মোটা হচ্ছে, লোকগুলোকে দেখে এমনও মনে হওয়ার কারণ নেই। কিন্তু এ নিয়ে কথা বাড়িয়ে লাভ হবে না। ভারতচন্দ্র লোকগুলোর অসহায় শূন্য চোখের দিকে আর চাইতে পারলেন না, দৃষ্টি নামিয়ে নিলেন।

'শয়তান—আদত শয়তান সব!' রঘুনন্দন গজরাতে লাগলেন।

মৃদু গলায় ভারতচন্দ্র বললেন, 'কিন্তু ধরে এনে কী লাভ হবে?'

'আখ-মাড়াইয়ের জাঁতায় ফেলব। রস আপনি বেরুবে।'

'আর আখ যদি ছিবড়ে হয়?'

'ছিবড়ে থেকেও রস আমরা বের করতে জানি—' আবার নিষ্ঠুর হাসি হাসলেন রঘুনন্দন।

ভারতচন্দ্র চুপ করে রইলেন। এর পরে আর কোনো কথাই বলবার নেই।

'হাজতে বন্ধ করে রাখব। বুকে বাঁশ-ডলা দেওয়া হবে। পিটিয়ে জোড়া হাড় ভেঙে দেব। খাজনা বেরিয়ে আসবে সুড় সুড় করে।'—রঘুনন্দন একবার আড়চোখে তাকালেন ভারতচন্দ্রের দিকে : 'আপনার এসব শুনতে নিশ্চয় খুব খারাপ লাগছে?'

ভারতচন্দ্র বললেন, 'আমার ভালো লাগা খারাপ লাগায় কী আসে যায়? যে কাজের যে নিয়ম।'

'যা বলেছেন'—রঘুনন্দন মাথা নাড়লেন : 'যে কাজের যা নিয়ম। আরে মশাই, আমরা কি একেবারে অমানুষ, না দয়াধর্ম করতে জানি না? কিন্তু কী করা যাবে? আমরা এদের ছাড়তে পারি, কিন্তু মুর্শিদাবাদের সরকার তো আমাদের ছেড়ে কথা কইবে না। জানেন বোধ হয়, একবার বারো লক্ষ টাকা খাজনার দায়ে বুড়ো নবাব কী হেনস্থা করেছিল মহারাজের? তাই কড়া হুকুম আমাদের ওপর, প্রজারা মরুক বাঁচুক, রসাতলে যাক—টাকা আমাদের আদায় করতেই হবে।'

'ওঃ।'

'তারপর দেখুন, সামনে দুর্গোৎসব আসছে, তার এক এলাহী খরচ। মহারাজার বাড়ির দুর্গাপুজো আপনি কখনো দেখেননি, এমন প্রতিমা মশাই কোথাও হয় না, এত ঘটা ভূ-ভারতে কোথাও দেখতে পাবেন না আপনি। তবু তো ইচ্ছেমতো সব করা যায় না, ধুমধামের মাত্রা বেশি হলে নবাব মনে করে, লোকটা অনেক পয়সা করেছে, সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়ে দেয় খাজনা, নয়তো কয়েক লক্ষ টাকার নজ্‌রানা চেয়ে বসে। তা-ও কম-সম করেই কি সোজা খরচা! পুজোর আর সব বাদ দিলেও তিনদিনে একশো মোষ পড়ে, পাঁটার রক্তে বান ডেকে যায়। সে-সব খরচ কোত্থেকে আসে বলুন?'

'ঠিক।'

'তাহলেই দেখুন—'

রঘুনন্দনের কথা থেমে গেল মাঝপথেই। সেই লোকটাই বোধহয় জলের জন্যে একবার গোঙিয়ে উঠেছিল, 'শালা শুয়ারকে বাচ্চা'— বলে সজোরে একটা লাথি তার পেটে বসিয়ে দিলে জাফর।

ভারতচন্দ্র আর সহ্য করতে পারলেন না। উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'মিত্তির

মশাই, আমি এখন যাই।'

'আসুন—আসুন। প্রণাম।'

এই রাজা—এই রাজত্ব! আখ-মাড়াইয়ের জাঁতায় ফেলে রস বের করতে হয়, নইলে রাজস্ব আদায় হয় না, রাজার ঠাট থাকে না, চুড়োয় চুড়োয় নিশান কাঙরা ঘড়ি শোভা পায় না, তোরণে নহবৎ বাজে না। অথচ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র দয়াধর্ম করেন, সমাজ প্রতিপালন করেন, দেশজোড়া পণ্ডিতদের মাসোহারা দেন,—ধার্মিক বলে তাঁর খ্যাতি আছে, নবদ্বীপের বিখ্যাত আগমবাগীশ বংশের কাছে দীক্ষা নিয়ে পরম কালীভক্ত মহারাজা তন্ত্র-সাধনাও করে থাকেন!

অথচ—

অথচ এই চল্লিশ টাকার মাসোহারা, রাজদরবারে খাতির, থালায় সাজানো সিধে—সব কিছু এক মুহূর্তে নিজের কাছে বিস্বাদ মনে হল। এদের সব কিছুর উৎস নিজের চোখেই তিনি এই মুহূর্তে দেখে এসেছেন। তাঁর বাপ নরেন্দ্রনারায়ণও কি এইভাবে প্রজা-পীড়ন করতেন? ঠিক মনে পড়ে না, তখন তিনি নিতান্ত বালক ছিলেন। তারপর লেখাপড়া শেষ করে বাড়ি ফিরে উকিল হয়ে তাঁকে বর্ধমানে যেতে হল। সেখান থেকে—

সব ঐশ্বর্য কি এমনি করে—এই পথ দিয়েই আসে? এমনিভাবেই কি ভগবান ভাগ্যবানদের অনুগ্রহ করেন? তাহলে মগ-হার্মাদ-বর্গীর ওপর অভিমান করা কেন? বর্গীরাও তো ধার্মিক, তারাও তো 'হর হর মহাদেও' ধ্বনি তুলে গ্রামের পর গ্রাম লুঠতে আসে। মেয়েদের ঘর থেকে টেনে নিয়ে যাওয়ার সময় তারাও ভক্তিভরে মন্দিরে প্রণাম করে যায়!

বর্গীর ওপর রাগ কেন? বড়লোকের গায়ে আঁচড় লাগে বলে?

দূর হোক, এ সব ভাবনা তাঁর নয়। তিনি রাজ-বয়স্য, রাজাকে খুশি রাখাই তাঁর কাজ।

বাসায় পা দিতেই এক গাল হেসে তাঁকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল রঘুনাথ পরামানিক।

'কর্তা, ভালো আছেন?'

ভারতচন্দ্র ভ্রূকুটি করলেন।

'হতভাগা, তুই এখানে?'

'আজ্ঞে, চলে এলুম।'

'চলে এলি? তুই না বলেছিলি, বুড়ো হয়ে যাচ্ছিস—এবার জাত-ব্যবসা করবি, জমি-জিরেত দেখবি, দুনিয়া চষে চষে তোর অভক্তি হয়ে গেছে? তাহলে আবার এসে জুটলি কেন এখানে?'

রঘুনাথ বিন্দুমাত্র বিচলিত হল না : 'আজ্ঞে শ্রীচরণ দর্শন না করে আর থাকতে পারলুম না।'

'ওঃ, ভক্তি কত! তা চরণদর্শন তো হল, এবার বাড়ি যা।'

'এজ্ঞে, বাড়ি যাব কী!'—রঘুনাথের মুখ আবার হাসিতে ভরে উঠল : 'আর এখান থেকে নড়ছিনি। বাসাটি ছোট্ট, কিন্তু দিব্যি। আর শহর বটে কেষ্টনগর! যেন পটে আঁকা ছবিটি, দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়। তা এইবার বাকী কাজটুকুও করুন ছোট কর্তা, ঝটপট মা-ঠাকরুণকেও এখেনে নিয়ে আসুন, আমি লক্ষ্মী-নারায়ণের যুগল রূপ দেখে কেতাত্থ হই।'

একবারের জন্যে উন্মনা হলেন ভারতচন্দ্র। লীলা!

'সেই লক্ষ্মীই বুঝি তোকে দূত করে পাঠিয়েছে এখানে।'

'আজ্ঞে না। তিনি রইলেন সেই কোথায় সারদাতে, আমি আসছি পেঁড়ো থেকে।'

'তবে সেই পেঁড়োতেই রওনা হও আবার।'

'আমি নড়লে তো!'

রাগ করতে গিয়েও ভারতচন্দ্র হেসে ফেললেন।

'আমি তো কাজের লোক একজন রেখেছি। দুজনকে আমি পুষতে পারব না।'

'আমাকে পোষবার জন্যে আপনাকে খরচ করতে হবে না। পাত-কুড়োনো খেলেই আমার পেট ভরবে!'

'তুই কি না মরা পর্যন্ত আমার সঙ্গ ছাড়বিনে রঘু?'

'আজ্ঞে না। বয়েসে তো বড়ো, আপনার আগেই যাব বলে আশা আছে। আর ওপারে গিয়েই আপনার গাড়ু-গামছা সব গুছিয়ে রাখব—নইলে সঙ্গে সঙ্গেই লোক আপনি পাবেন কোথায়?'

ভারতচন্দ্র আবার হেসে ফেললেন। তারপর চাদরের খুঁট থেকে বের করলেন টাকাগুলো।

'নে, তবে এগুলো তুই-ই রাখ্। মাস চালাতে হবে। টাকা পয়সার হিসেব আমি রাখতে পারি না, ভালোও লাগে না। তোরই জিম্মায় রইল। কিন্তু দেখিস, বেশি চুরি-চামারি করিসনি।'

'আজ্ঞে সে জন্যেই তো বলি, মা-ঠাকরুণকে—'

'বেশি বকিস্নি। তাহলে কালই সিপাই সর্দার জাফরকে দিয়ে তোকে খড়ে পার করিয়ে দেব। জ্বালাতে যখন এসেইছিস, তখন সব দেখেশুনে নে—আমি ঘুরে আসছি একটু।'

আবার পথ। নবদ্বীপ ছেড়ে কৃষ্ণনগরে নিজের নামে শহর পত্তন করেছেন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র—মনের মতো করে সাজিয়েছেন। অবশ্য ফরাসডাঙার সঙ্গে কোনো তুলনা হয় না, সে জাঁকজমক, সেই গমগমে বাজার, সেই দেশ-বিদেশের মানুষ, হাজার হাজার দালান-কোঠা, সেই আকাশছোঁয়া অর্লেয়াঁর কেল্লা, গঙ্গার ঘাটে জাহাজ আর নৌকোর সার, তার চেহারাই আলাদা। তবু কৃষ্ণ-নগরের শোভাও দেখবার মতো। ফরাসডাঙা যেন বাজার, কৃষ্ণনগর যেন

বাগানবাড়ি। মনোরম রাজপ্রাসাদ, পাত্র-মিত্র, রাজার আত্মীয়স্বজনের সাজানো-গোছানো বাড়ি, পুকুর, মন্দির; দোকান-বাজার, রং-বেরঙের মিঠাই, কত রকমের মাটির পুতুল; তাঁতী-কাঁসারী-স্বর্ণকার-শাঁখারী; এমনকি একদল গণিকা পর্যন্ত এসে জাঁকিয়ে বসেছে।

একটা পুতুলের দোকানের সামনে দাঁড়ালেন কিছুক্ষণ। রাধাকৃষ্ণের একটি যুগলমূর্তি বড়ো ভালো লাগল, শাক্ত বংশের ছেলে হয়ে তান্ত্রিক মহারাজের আশ্রয়ে থেকেও বৈষ্ণব ভাবটা মন থেকে একেবারে যায়নি। কিন্তু সঙ্গে পয়সা ছিল না, যুগলমূর্তিটি কেনা গেল না। একবার তুলে দেখেই নামিয়ে রেখে যাওয়ার জন্যে পা বাড়ালেন।

দোকানী বললে, 'কী হল ঠাকুরমশাই, নিলেন না?'

'আজ থাক।'

'বউনির সময়, নিয়ে যান। যা ইচ্ছে তাই দিন।'

'একটাও পয়সা নেই আমার কাছে, কিছু মনে কোরো না'—ভারতচন্দ্র লজ্জিতভাবে এগিয়ে চললেন।

কয়েক পা যেতেই পেছন থেকে ডাক এল : 'ঠাকুরমশাই!'

চমকে ফিরে চাইলেন ভারতচন্দ্র। অল্পবয়েসী একটি রূপবতী মেয়ে। ঠোঁটে টুকটুকে পানের রং, কপালে টিক্‌লি, পরনে রঙিন পাছা-পাড় শাড়ি, দু হাতে সোনার দুটি ভারী কঙ্কণ। দেখবামাত্র বুঝতে বাকী রইল না, মেয়েটি রূপোপজীবিনী।

কী বিপদ! এ আবার তাঁকে ডাকে কেন?

'একটু দাঁড়িয়ে যাবেন ঠাকুরমশাই।'—মেয়েটি চলার গতি বাড়িয়ে তাঁর সামনে চলে এল।

'কী চাই তোমার?'

আঁচলের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল ছোট সেই যুগলমূর্তিটি।

'এইটি নিয়ে যান আপনি।'

আশ্চর্য হয়ে ভারতচন্দ্র চেয়ে রইলেন মেয়েটির দিকে। মেয়েটি ঠোঁট টিপে হাসল, চঞ্চল চোখ দুটো আলো-পড়া জলের মতো চিকচিক করে উঠল।

'কেন নেব তোমার জিনিস?'

'ঠাকুর, আমি পাপীয়সী হতে পারি, কিন্তু এ তো দেবতার মূর্তি। নিতে দোষ নেই।'

ভারত বুঝতে পারলেন, কাছাকাছিই কোথাও দাঁড়িয়েছিল মেয়েটি, তাঁকে লক্ষ্য করছিল। হোক দেবতার মূর্তি, কিন্তু গণিকার দান—ভারতচন্দ্র দু পা পিছিয়ে গেলেন।

'ও তুমিই রাখো।'

'ঠাকুর, আপনি শাস্ত্র জানেন, আপনি কবি। আপনার দেবতারও যে আচার-বিচার আছে সে তো বুঝতে পারিনি।'

ভারতচন্দ্র থমকে দাঁড়ালেন।

'তুমি কি আমাকে চেনো?'

মেয়েটি আবার মুখ টিপে হাসল, কথাটার জবাব দিলে না। তারপর বললে, 'এটা আপনি নেবেন না?'

এক মুহূর্তের দ্বিধা করে ভারতচন্দ্র বললেন, 'দাও।'

মূর্তিটি হাতে তুলে দিয়ে মেয়েটি গলবস্ত্রে প্রণাম করল ভারতচন্দ্রকে।

'চিরজীবিনী হও।'

'ও আশীর্বাদ করবেন না—আমাদের আয়ু বাড়লে সংসারের পাপ বাড়ে। দাসীর নাম চন্দ্রাবলী। সাহস করে তো আর কুঞ্জে যেতে বলতে পারি না, যদি কৃপা হয়, নামটি স্মরণে রাখবেন।'

ধীরে ধীরে এগিয়ে চলে গেল। ভারতচন্দ্র দাঁড়িয়ে রইলেন। একবারের জন্যে তাঁর মনে পড়ে গেল বিদ্যাধরীকে। কোথায় যেন মিল আছে দুজনের ভেতরে—কিছুটা বোঝা যায়, সবটা বোঝা যায় না।

॥ আট ॥

কৃষ্ণনগরে দুর্গোৎসব এসে পড়ল।

ঢাকী-শানাইদার-কাঁশিওলা আসতে শুরু করল দেশ-বিদেশ থেকে, চণ্ডীমণ্ডপে তৈরী হতে লাগল রাজবাড়ির বিখ্যাত প্রতিমা—নতুন নতুন দোকান-পশার বেড়ে গেল দেখতে দেখতে।

রঘুনন্দন মিস্তিরের নিঃশ্বাস ফেলবার সময় নেই, জাফরেরও না। আখ-মাড়াইয়ের জাঁতা থেকে রস বেরিয়ে আসছে নিয়মিত—অনেক টাকা দরকার। রাজা কংসনারায়ণের দুর্গোৎসব ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছে—মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পুজোর কাছে সে ইতিহাস ম্লান করে দেওয়া চাই।

পাত্র-মিত্রদের কারো নিঃশ্বাস ফেলবার সময় নেই, রাজা স্বয়ং ব্যতিব্যস্ত। তারই ফাঁকে ফাঁকে অন্তরঙ্গদের নিয়ে আসর করে বসেন। মুর্শিদাবাদ থেকে ফেরবার পরে তাঁর মনে সব সময় একটা চাপা অশান্তি থমথম করছে। ভাঙা শরীর নিয়ে আলীবর্দী এখনো চালিয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু তাঁর যে আর বেশি দিন বাকী নেই, এ-কথা বুঝতে কারো অসুবিধে হয় না। চোখের মণি মীর্জা মামুদকে তিনি নবাবী দিয়ে যাবেন, তাতেও সন্দেহ নেই। শুধু ভরসা নওয়াজেস্ মহম্মদ। সে নবাব হলে সব দিক বজায় থাকে, কিন্তু—

কিন্তু রাজবল্লভ! ঢাকার মহারাজ রাজবল্লভ।

নওয়াজেসের বেগম ঘসেটি সম্পর্কে হোসেন কুলীর যে অপযশ ছিল, সে অপবাদ রাজবল্লভেরও কিছু কম নয়, বরং লোকে অন্য কথাই বলে। কিন্তু ঘসেটির সঙ্গে রাজবল্লভের সম্বন্ধ যা-ই হোক, আসলে তাঁর আঙুলের ইশারায় ঘসেটি ওঠা-বসা করেন। শোনা যাচ্ছে, মীর্জা মামুদকে সরাতে পারলে ঘসেটির পোষ্য শিশুটিকে নামকে-ওয়াস্তে নবাব সাজিয়ে আসলে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব হয়ে বসবেন রাজবল্লভ স্বয়ং। আর নওয়াজেসের জন্যে গুপ্ত ঘাতকের একটি ছুরির ফলাই যথেষ্ট।

এই সম্ভাবনাটাই বেশি করে পীড়ন করছে মনকে। নওয়াজেস্ অন্তত ভদ্রলোক, বুদ্ধি-বিবেচনা আছে, মাথা ঠাণ্ডা; মীর্জা মামুদ দুরন্ত আর উদ্ধত হতে পারে, চরিত্রদোষও তার আছে, কিন্তু সে বীর, তার সঙ্গে চালাকি না করলে সে অকারণে কাউকে ঘাঁটাবে না। আর রাজবল্লভ? যেমন খল, তেমনি অত্যাচারী। একবার ক্ষমতা হাতে পেলে সে আর তার ছেলে কৃষ্ণবল্লভ যে কী কাণ্ড করতে থাকবে, তা অনুমানও করা যায় না।

শুধু কলকাতার কুঠির ইংরেজেরা হয়তো এ সময়ে কিছু সাহায্য করতে পারে। তাদের অনেকের সঙ্গেই কৃষ্ণচন্দ্রের বন্ধুত্ব আছে। লোকগুলো কূট-কৌশলী, লোভী, স্বার্থপর; উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে না পারে এমন কাজ নেই; তার ওপর যোদ্ধার জাত, প্রত্যেকেই তলোয়ার-বন্দুক নিয়ে লড়াইয়ে নেমে পড়তে পারে, দরকার হলে প্রাণ দিতে পারে। কিন্তু তারা তো ব্যবসা করতে এসেছে, টাকা কামানোই তাদের লক্ষ্য। এ সমস্ত ব্যাপারে মাথা গলাতে তারা রাজী হবে? মীর্জা মামুদকে তারা আদৌ পছন্দ করে না, কিন্তু তাই বলে এই সব চক্রান্তের তারা শরিক হবে? একবার অন্যান্য মহাজনদের জাহাজ লুটের দায়ে নবাব আলীবর্দীর কাছে ফিরিঙ্গীদের বারো লক্ষ টাকা জরিমানা দিতে হয়েছিল, তার পেছনেও মীর্জা মামুদের হাত ছিল। সে-কথা তারা নিশ্চয় ভুলে যায়নি, কিন্তু তাই বলে—

একবার কলকাতায় গিয়ে ড্রেক সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে পারলে মন্দ হয় না। কিন্তু নবাবের কানে গেলে অবস্থা কী দাঁড়াবে তা বলা মুশ্‌কিল। দেখা যাক।

মনের অস্বস্তি ভোলবার জন্যেই বারে বারে কবির ডাক পড়ে।

'ওহে, রসের কবিতা শোনাও দুটো-একটা। মন-মেজাজ ভালো করে দাও।'

ভারতচন্দ্র সঙ্গে সঙ্গে শোনাতে থাকেন শ্রীকৃষ্ণের উক্তি :

> 'বয়েস আমার অল্প নাহি জানি রসকল্প
> তুমি দেখাইয়া তল্প জাগাইলা যামী।
> ননী-ছানা খাওয়াইয়া রসরঙ্গ শিখাইয়া
> অঙ্গভঙ্গ দেখাইয়া তুমি কৈলা কামী—'

কোনোদিন হিন্দী কবিতার ফরমাস হয়। তথাস্তু।

> 'ধুম্‌ বড়া ধুম্‌ কিয়া খানে শোনে নাহি দিয়া
> চ'হুয়ার ঘের্‌ লিয়া ফৌজ্‌ কিসি কাওয়া,
> বালাখানা কোট্‌ কিয়া কানাৎ সে ঘের্‌ লিয়া
> ত'হুয়ান্‌ দাগা দিয়া আগ্‌ কিসি তাওয়া—'

চমৎকার জীবন! নিজেকে বিদূষকের মতো মনে হয় ভারতচন্দ্রের।

রাজদরবারে কবির আসন পাওয়ার স্বপ্ন ছিল, সে স্বপ্ন তাঁর সফল হয়েছে। কিন্তু বিক্রমাদিত্যের সভা নয় যে, রঘুবংশ-মেঘদূত রচনা করবার ফরমাস আসবে। রাজা ভোজের দরবার নয় যে, শ্রুতিধর মহাপণ্ডিতেরা তীক্ষ্ণ বুদ্ধি-বিবেচনা নিয়ে অলঙ্কার-শাস্ত্রের লক্ষণ মিলিয়ে মিলিয়ে কবিতার গুণা-গুণ বিচার করবেন; বাদশা আকবরের নবরত্ন নয় যে, খান-খানানের মতো রসিকপুরুষ চার পঙক্তি শুনে চার লক্ষ টাকা পুরস্কার দেবেন। সে যুগ

গেছে। এখন যেমন রাজা, তেমনি রাজকবি।

আগে যাঁরা প্রজাপালন করতেন, এখন তাঁরা আখ-মাড়াইয়ের জাঁতাকেই রাজ্য চালাবার একমাত্র উপায় বলে জেনেছেন; বাইরে থেকে শত্রু কিংবা দস্যুতে আক্রমণ করলে যাঁরা তলোয়ার হাতে আগে বেরিয়ে পড়তেন, এখন তাঁরা ছুটন্ত ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনলে বর্গী ভেবে সকলের আগে পালাবার রাস্তা খোঁজেন। বিলাস-ভোগ আগেও ছিল, কিন্তু এখন সেইটেই শেষ কথা।

আর প্রজা?

ধর্ম-কর্ম সব অভ্যাসে দাঁড়িয়েছে। কিছুদিন আগে নবদ্বীপ থেকে একটা খেউড়ের দল এসেছিল। রাধাকৃষ্ণের প্রেমকাহিনী নিয়ে যে গান তারা শুনিয়ে গেল, তাতে কানে আঙুল দিতে হয়। ব্রাহ্মণেরা সংস্কৃত পড়তে ভুলে যাচ্ছেন—কী হবে মিথ্যে ওসব চর্চা করে? তার চেয়ে গুরুগিরি ভালো—তাতে বিদ্যার দরকার হয় না, পায়ের ধুলো দিতে জানলেই চলে; তাতেও যদি সুবিধে না হয়, রাজা-জমিদারের ভাট-বিদূষক হয়ে বসলেই চলে; পৈতেটা মোটা থাকা দরকার, আর দরকার গলা খুলে রাজার গুণগ্রাম বর্ণনা করে যাওয়া, তারস্বরে আশীর্বাদ করে যাওয়া।

ব্রাহ্মণ, জমিদার, সমাজপতি যেদিকে চলে—সমাজের গতিও সেই দিকে। ঘরে ঘরে পাপ ঢুকেছে; আখড়ায় আখড়ায় ব্যভিচার. তন্ত্রের নামে পঞ্চ 'ম' কারের লৌকিক উপাসনা। চারদিকে অন্ধকার। যেমন রাজসভা, তেমনি রাজ-কবি। আলোহীন, ভবিষ্যৎহীন এই অমাবস্যার ভেতরে অমাবস্যার গান।

'কী কবি, মুখ এত গম্ভীর কেন?'—মহারাজ প্রশ্ন করেন।

উত্তরটা গোপাল ভাঁড়ই জুগিয়ে দেয়: 'আজ্ঞে, খুড়ী তো এখানে নেই, তাই খুড়োর মন-মেজাজ ভারী খারাপ।'

'কষ্ট পাচ্ছ কেন হে, আনিয়ে নাও না এখানে।'

'আনাবারই বা কী দরকার? মহারাজের কৃষ্ণনগর তো কল্পতরু—খুড়ো ইচ্ছে করলে একটা কেন, সঙ্গে সঙ্গে দশটা খুড়ী এসে হাজির হবে।'

ভারতচন্দ্র হাসেন, জবাব দেন না। রাজার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ফিরে আসেন বাসার দিকে। কৃষ্ণনগরের পথে পথে মহাপুজোর ভিড়। রাজবাড়ির সামনে কয়েক-শো পাঁঠা-মোষ বাঁধা—পুজোর বলি; ওদিকে রঘুনন্দন মিত্তিরের কাছারীবাড়ি জমজমাট। দুটোর অর্থই এক—কোনো তফাৎ নেই।

• বাসায় ফিরতে দেখেন, দাওয়ায় একটি কলাপাতার ওপর কয়েকটি আধ-ফোটা শ্বেতপদ্ম। পদ্মগুলো আকারে অনেক বড়ো—সচরাচর দেখা যায় না।

ভারী ভালো লাগল। এই পদ্ম দিয়ে আজ পুজো করবেন।

'কে দিলে রে ফুলগুলো?'

'আজ্ঞে, একটি মেয়েছেলে। অল্প বয়েস, দিব্যি চেহারা। স্নান করে, গরদের শাড়ি প'রে এসেছিল। জিজ্ঞেস করলুম, কে আপনি? বললে, নামের দরকার

নেই, ঠাকুরমশাইকে ফুলগুলো দিয়ো।'

চন্দ্রাবলী!

মেয়েটির পরিচয় আজ আর ভারতচন্দ্রের অজানা নেই। রাজার সভার অনেক নর্তকীদের মধ্যে সে-ও একজন। সেইজন্যেই ভারতচন্দ্রকে সে চেনে।

চন্দ্রাবলীর দেওয়া ফুল দিয়ে তিনি পুজো করবেন?

আবার মনে পড়ল বিদ্যাধরীকে। যার জন্যে দেশের ব্রাহ্মণেরা কেউ ইন্দ্রনারায়ণের অন্ন গ্রহণ করেন না, তাকে তিনি সেদিন প্রণাম করেছিলেন। আর এই ফুল তো সে-ই দিয়েছে, যে তাঁর হাতে দেবতার বিগ্রহ তুলে দিয়েছিল।

এই পদ্ম দিয়েই তিনি পুজো করবেন; এর চাইতে পবিত্র আর কিছু নেই।

রঘুনাথ বললে, 'রাজবাড়ির প্রতিমা যা একখানা তৈরী হচ্ছে, আপনি দেখেছেন কর্তা? বাপ্‌স, কী কান্ড! আপনার শ্রীচরণের ছায়ায় ছায়ায় অনেক দেশ তো ঘুরে এলুম, কিন্তু এমন একখানা এলাহী কারবার—'

ভারতচন্দ্র অন্যমনস্ক ছিলেন। সংক্ষেপে বললেন, 'জাঁতা।'

রঘুনাথ চমকে উঠল : 'কী বললেন আজ্ঞে?'

লজ্জা পেয়ে ভারতচন্দ্র বললেন, 'না না, কিছু নয়। আমি এখন স্নান করব, তুই জল এনে দে।'

বিকেলের দিকে রাজবাড়ীর মন্দিরে প্রণাম করে বেরিয়ে আসছিলেন ভারত-চন্দ্র। চোখে পড়ল, একটু দূরে বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার আসছেন।

ভারতচন্দ্র রাজার কবি-বয়স্য, রাজার অবসর-বিনোদনের সঙ্গী; কিন্তু আসল সভাকবি হলেন বাণেশ্বর। পরম পণ্ডিত, অত্যন্ত সুকবি। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র কখনো কখনো তাঁর সাহায্য নিয়ে সংস্কৃত কবিতা রচনা করেন। বাণেশ্বর ভারতচন্দ্রকে শঙ্কর কিংবা গোপাল ভাঁড়ের সমপর্যায়ী বলেই মনে করেন—উপেক্ষার দৃষ্টিতেই দেখে থাকেন।

ভারতচন্দ্র রাজপণ্ডিতকে প্রণাম করলেন। আশীর্বাদ করে বাণেশ্বর সংক্ষেপে বললেন, 'কুশল?'

'আপনাদের আশীর্বাদে।'

'তোমরা রাজার প্রসাদ পেয়েছ, ব্রাহ্মণের আশীর্বাদ তোমাদের পক্ষে অনাবশ্যক।'—বাণেশ্বরের গলায় অপ্রীতি আর গোপন রইল না : 'তা রাজাকে কবিতা শুনিয়ে অর্থাগম ভালোই হচ্ছে নিশ্চয়?'

ভারতচন্দ্রের মুখের ওপর দিয়ে রক্ত ছুটে গেল এক ঝলক। বিদ্যালঙ্কার বলছেন, চাটুবৃত্তি দিয়ে অর্থাহরণই ভারতচন্দ্রের একমাত্র কাজ। অপমানটুকু

মুখ বুজে সহ্য করা গেল না।

'অপরাধ ক্ষমা করবেন বিদ্যালঙ্কার মশাই। মহারাজের সভাকবিও রাজ-প্রসাদের আকাঙ্ক্ষাতেই কাব্য রচনা করেন। তাঁরও অর্থাগম মন্দ হয় না।'

কঠিন গলায় বাণেশ্বর বললেন, 'বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার দেবভাষায় কাব্য রচনা করে থাকে, রাজার সারস্বত সাধনায় সাহায্য করে। সে ইতর এবং যাবনিক ভাষায় চুট্‌কি রচনা করে না।'

'চুট্‌কি সংস্কৃতেও রচনা করা যায়, অনেক পণ্ডিত তা করেও থাকেন।'—ভারতচন্দ্র সবিনয়ে বললেন, 'আর যদি ভাষার কথা বলেন তা হলেও বাংলাতেও কাব্য রচনা করা যায়—যাবনিক ভাষার পদ্মেও সরস্বতী অধিষ্ঠান করেন।'

'না, করেন না।'—সক্রোধে বাণেশ্বর বললেন, 'তুমি না ব্রাহ্মণ-সন্তান? জানো না, দেবভাষা ছাড়া অন্য কোনো ভাষায় কাব্য রচনা নিষিদ্ধ?'

'না, জানি না। কোন্ শাস্ত্রে আছে জানালে বাধিত হই। শাস্ত্র কিছু কিছু আমিও পড়েছি।'

রক্ত-চক্ষে কিছুক্ষণ তাঁর দিকে চেয়ে রইলেন বাণেশ্বর। তারপর বললেন, 'তোমার সঙ্গে অকারণে বাক্যব্যয় করবার সময় আমার নেই। মহাপণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন কৃষ্ণনগরে পদধূলি দিয়েছেন, আমি তাঁরই সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চললুম।'

বাণেশ্বর দ্রুত চলে গেলেন। মৃদু নিঃশ্বাস ফেলে এগিয়ে চললেন ভারত-চন্দ্র।

আসন্ন পুজোকে উপলক্ষ করে শহর জম-জমাট। এখানে সং, ওখানে নাচ, সেখানে হুল্লোড়। একজন অন্ধ একতারা বাজিয়ে বর্গীর হাঙ্গামার গান গাইছিল :

'আহা, ঘরেতে আগুন দিল, লুটি নিল সব,
আর কোনো শব্দ নাই, 'তঙ্কা-তঙ্কা' রব!
আর, শিশুরে আছাড়ি ফেলে মা-র কোল হইতে—'

ভারতচন্দ্র দাঁড়িয়ে পড়লেন। লোকটার কপালে মস্ত একটা কাটা দাগ। তলোয়ারের কোপ পড়েছিল মনে হয়। চোখ দুটোতেও অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন, সে জন্মান্ধ নয়।

গান থামলে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার দেশ কোথায় গো?'

'দেশ অনেক দূরে, মশায়। চন্দ্রকোণা।'

'চন্দ্রকোণা? কী করতে সেখানে?'

'চন্দ্রকোণার মানুষ শুনছ, আবার জিজ্ঞেস করতে হয় নাকি? তাঁত ছিল, তাঁত। তাতেই মরাই ভরা ধান থাকত, গোয়াল ভরা গোরু থাকত। কিন্তু অদেষ্ট।'—কপালে করাঘাত করল লোকটা।

'বর্গী?'

'বর্গী ছাড়া কী আর?'—লোকটা একটু থামল : 'চোখের সামনে মা-বাপ-ভাইকে বল্লমে ফুঁড়ল, বৌটাকে'—মনে হল যেন তার গলার স্বরকে কেউ বুকের ভেতরে টেনে নিতে চাইছে : 'তবু ভাগ্যি ভালো মশাই, তার আগেই আমার কপালে বসিয়েছিল খাঁড়ার ঘা, চোখের ভেতরে লোহার শলা পুরে দিয়েছিল!' —কাঁধের ছেঁড়া গামছাটা দিয়ে সে চোখ মুছে ফেলল একবার : 'যাক গে সে সব কথা—কিছু দেবেন?'

ভারতচন্দ্র লোকটিকে একটা পয়সা ফেলে দিলেন।

বাবরী চুল, গলায় সোনার হার, কানে বীরবৌলি আর হাতে বুল্‌বুলি নিয়ে অল্প বয়েসী একটা ছোকরা তার সঙ্গীর কাছে বক্তৃতা দিচ্ছে। অন্ধের গান থেকেই আলোচনাটা শুরু হয়েছে খুব সম্ভব।

'বর্গীর সামনে দাঁড়ানো কি বাঙালীর কাজ বাবা? সাক্ষাৎ যমদূতের মতো চেহারা সব, দেখলেই দাঁতকপাটি লাগে। দূরে বর্গীর ঘোড়ার শব্দ শুনলেই কি জমিদার কি কৃষাণ, যে যা পারে গুছিয়ে নিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাতে আরম্ভ করে। অনেক সময় বৌ-ছেলেমেয়ে পর্যন্ত পেছনে পড়ে থাকে।'

সঙ্গীটি বললে, 'হুঁ। আত্মানং সতত রক্ষেৎ দারৈরপি ধনৈরপি। কিন্তু আমি ভাবছি, বর্গীরা যদি শেষে এই কৃষ্ণনগরেও এসে পৌঁছোয়, তখন কী হবে?'

'আরে, এখানে কি আর চালাকি চলে? মহারাজের সৈন্য-সামন্ত আছে না? ভোজপুরী, বুন্দেলখণ্ডী, পাঠান, মোগল, জাঁদরেল বীর সব। বর্গীকে তারা কচু-কাটা করে ফেলবে। ভেতো বাঙালী তো আর নয় যে আচমকা ছাগলের পায়ের আওয়াজ শুনেও পিলে কেঁপে ওঠে, ভাবে ঘোড়সোয়ার এল বুঝি!'

'কে জানে, কিছু বিশ্বাস নেই!'—সঙ্গীটি নিঃশ্বাস ফেলল : 'নবাব আলীবর্দী পর্যন্ত বর্গীকে এঁটে উঠতে পারেন না, আর এ তো—! কিন্তু তোমার কথাটা আমার গায়ে লাগছে। ভেতো বাঙালীকে তুমি একেবারে উড়িয়ে দিলে? জানো তো, আমি গোয়ালার ছেলে। আমার ঠাকুর্দা ছিল নামজাদা লেঠেল, একা একশো জনের মহড়া নিতে পারত, বর্ধমান থেকে মুকসুদোবাদ পর্যন্ত সবাই চিনত তাকে। আজ কি ভোজপুরী-মোগল-রাজপুত নইলে বাঙালী জান-মান বাঁচাতে পারে না?'

'পারেই না তো। বাঙালীর সে-সব দিন আর নেই হে। এখন শুধু কাঁদতে জানে আর মরতে জানে। তুমি বলছিলে, তোমার ঠাকুর্দা হ্যানো ছিল ত্যানো ছিল। আর তুমিই তো এখন নেংটি ইঁদুর দেখলে মূর্চ্ছো যাও।'—হাতের বুলবুলের উদ্দেশ্যে একটা শিস দিয়ে শৌখিন ছোকরাটি বললে, 'ও সব কথা ছেড়ে দাও, ভাই। বর্গী এলে সবাই পালায়, আমরাও পালাব—সেজন্যে আর ভাবনা কী!'

'না, ভাবনার আর কী আছে! যঃ পলায়তে স জীবতি।'

'খুব যে সংস্কৃত কপচাচ্ছ তখন থেকে। পেলে কোথায়?'

সঙ্গীটি হাসল : 'আমার বাড়ীর পাশেই যে চতুষ্পাঠী রয়েছে। পোড়োদের কয়েক জনের সঙ্গে আমার ভারী ভাব, মধ্যে মধ্যে তাদের ভাঙের সরবতের জন্যে আমাকেই ঘন দুধ জোগান দিতে হয় কি না! তাদের মুখেই এ-সব শুনি। তা ছাড়া কত যে রসালো শোলোক আছে সংস্কৃতে, সে আর তোমায় কী বলব।'

'রসালো শ্লোক পরে হবে। ওদিকে নাচ হচ্ছে, চলো যাই।'

পথের ধারের একটা কাঞ্চন গাছের গায়ে ঠেসান দিয়ে ভারতচন্দ্র দাঁড়িয়ে পড়লেন। কথাগুলো চমৎকার লাগছিল শুনতে। বর্গী এলেই পালাব—পালানো ছাড়া কী-ই বা করবার আছে! 'দারৈরপি ধনৈরপি' নিজের প্রাণটাকে সকলের আগে বাঁচানো দরকার। আর তা ছাড়া মোগল-বুন্দেলী-ভোজপুরী তো আছেই। বাঙালীর ঘর, বাঙালীর মান পারলে তারাই বাঁচাবে, সে-সম্পর্কে বাঙালীর কোনো কর্তব্য নেই!

কবিকঙ্কণ তবু তো চণ্ডীকে ডেকেছিলেন। এ-কালের মানুষ দেবতাকেও বিশ্বাস করে না, ধর্মকেও না। নিতান্ত অভ্যাসে যেটুকু মানতে হয় তাই মানে। এদের বাঁচাবে কে?

মনে মনে অনুতপ্ত বোধ করতে লাগলেন ভারতচন্দ্র। নীলাচল ছেড়ে চলে না এলেই ভালো করতেন। তা হলে এই বাংলা দেশকে দেখতে হতো না, এই বাঙালীকেও না। সেই কতকাল আগে যখন দেশ ছেড়েছিলেন, তখনো দেশে দেখেছিলেন হাঙ্গামা, দেখেছিলেন আকাল, দেখেছিলেন এক সের মিঠাইয়ের দাম এক কাহন, আধ পণে আধ সের চিনি কিনতে হয়, কাপড় অগ্নিমূল্য, চারদিকে হাহা রব। এই কুড়ি বছরে অবস্থা এতটুকু বদলায়নি, আরো নেমে গেছে। তবু সেদিন বাঙালীর কিছু শক্তি-সামর্থ্য, কিছু সাহস ছিল; আজ তা-ও শেষ হয়ে এসেছে। এরই মধ্যে ঝলমল করছে কৃষ্ণনগর, চলছে নাচ-গান, ঘুরছে রঘুনন্দনের জাঁতা—যেন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র শ্মশানে বাসর সাজিয়েছেন!

অন্যমনস্কভাবে ভারতচন্দ্র পা বাড়ালেন। হঠাৎ এক সময় চমক ভাঙল তাঁর। যেন তাঁকে উপলক্ষ করেই অনেকখানি হাসি চারদিকে বিদীর্ণ হয়ে পড়েছে।

চেয়ে দেখলেন, সামনেই তরুণী নর্তকী। তাকে ঘিরে রসিক দর্শকের দল, ভারতচন্দ্রও কখন গিয়ে তাদের মধ্যে দাঁড়িয়েছেন টের পাননি। আর তাঁর দীর্ঘ উজ্জ্বল কান্তি দেখে নর্তকী কী বুঝেছে সে-ই জানে, সুর্মাটানা চোখে মর্মঘাতী কটাক্ষ হেনে এগোচ্ছে তাঁর সঙ্গে। 'সঙ্গতী'র ছড় কাঁপছে সারেঙ্গীর ওপর, উর্দুতে গান গেয়ে নর্তকী বলছে, 'এতক্ষণ ধরে কেঁদে কেঁদে ফিরছিলুম, কোথায় ছিলে জীবন-বল্লভ? এসো-এসো—আলিঙ্গন দাও আমাকে—'

দু-হাত বাড়িয়ে এমন করে অগ্রসর হল, যেন সত্যিই আলিঙ্গন করতে

চায়। সসংকোচে, সভয়ে পিছিয়ে গেলেন ভারতচন্দ্র, আর উচ্ছ্বসিত হাসির হর্‌রা উঠল জনতার মধ্যে।

গান থামিয়ে কলকণ্ঠে নর্তকী বললে, 'ছি-ছি ব্রাহ্মণ ঠাকুর, এ কি ব্যবহার তোমার? এমন রূপ, এমন রসিকের মতো চেহারা—সুন্দরীর আলিঙ্গনের ভয়ে তুমি পালিয়ে গেলে?'

নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে কৌতুকের হাসি হাসলেন ভারতচন্দ্র।

'তুমি ভুল বুঝেছ সুন্দরী। আলিঙ্গনের ভয়ে নয়, মৃত্যুভয়ে।'

'মৃত্যুভয়! আমি বাঘ না ভালুক?'

'সুন্দরি, বাঘ-ভালুক তো অতি তুচ্ছ। জানো তো, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ একখানা গোবর্ধন ধারণ করতে হিমসিম খেয়ে গিয়েছিলেন। দুখানি গিরি-গোবর্ধন তুমি বয়ে বেড়াচ্ছ, তাদের চাপ কি আমি সইতে পারব? চিঁড়ে-চ্যাপ্‌টা হয়ে যাব যে!'

নর্তকীর গাল সঙ্গে সঙ্গে রাঙা টুকটুকে হয়ে উঠল, লজ্জার ছায়া নামল উজ্জ্বল, প্রগল্‌ভ চোখের তারায়, কী জবাব দেবে খুঁজে পেল না।

'বেড়ে বলেছেন—চমৎকার বলেছেন'—কৃষ্ণনগরের রসিক জনতা রসিকতাটা পূর্ণমাত্রায় উপভোগ করে সাধুবাদ দিলে ভারতচন্দ্রকে, ফেটে পড়ল অট্টহাসিতে।

আর সেই অবসরে, দ্রুত পা ফেলে ভারতচন্দ্র অদৃশ্য হয়ে গেলেন সেখান থেকে। তখন সন্ধ্যা নামছিল শহরে—ঘনিয়ে আসা অন্ধকারের ভেতরেই মিলিয়ে গেলেন তিনি।

মহানবমীর রাত্রিতে বিশাল নাটমন্দিরে বিখ্যাত গায়ক নীলমণি কণ্ঠাভরণ 'চণ্ডীমঙ্গলে'র পালা গাইছিলেন।

মন্দিরা বাজছে, করতাল বাজছে, মৃদঙ্গ বাজছে। ঝাড়লণ্ঠনের আলোয় চারদিক ঝকমক করছে দিনের আলোর মতো; সামনে ডাকের সাজ আর শল্‌মা-চুম্‌কিতে অপূর্ব সুন্দর বিরাট প্রতিমা যেন দেবলোকের দ্যুতিতে ঝলমল। চামর-ছত্র নিয়ে সুধাকণ্ঠে কণ্ঠাভরণ গাইছেন মশানে শ্রীমন্তের চৌতিশা স্তুতি —এই অন্তিমকালে সর্বসংকটবারিণী দেবী চণ্ডিকার কাছে বরাভয় প্রার্থনা করছেন তিনি।

ওপরে চিকের আড়ালে রাজপরিবারের মহিলারা. আসরের সামনে জরির কাজকরা মখমলের তাকিয়ায় হেলান দিয়ে মহারাজা. পাশে পাত্র-মিত্র পারিষদের দল, কয়েকজন ইংরেজ বণিক, মহারাজার নিমন্ত্রণে তাঁরা দুর্গোৎসব দেখতে এসেছেন; কিন্তু ফিরিঙ্গিরা গান শুনছেন না, ফিস ফিস করে নিজেদের মধ্যে কী যেন আলাপ করছেন চাপা গলায়। একদিকে একটি ছোট দল করে বসে

রয়েছেন দিক্‌পাল সব নৈয়ায়িক আর শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা—হরিরাম তর্কসিদ্ধান্ত, কৃষ্ণানন্দ বাচস্পতি, রামগোপাল সার্বভৌম, বীরেশ্বর ন্যায়পঞ্চানন আর রাজকবি বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার। আজকের দিনে রাজা আর তাঁদের গুরু-গম্ভীর সঙ্গ কামনা করছেন না, কারণ রাজার মেজাজ আজকে তরল। নাট-মন্দির লোকের ভিড়ে কানায় কানায় উপচে পড়ছে, বাইরেও হাজার হাজার প্রজা দাঁড়িয়ে নীলমণির দরাজ কণ্ঠের গান শুনছে। রাজা এবং সাঙ্গোপাঙ্গদের অনেকেরই চোখ একটু ঘোর লাগানো, মহানবমীর রাত্রে শাক্ত মতে সবাই কিছু কিছু 'কারণ' করেছেন। ভারতচন্দ্র একটু সঙ্কুচিত হয়ে বসে আছেন, কারণ-বারির ব্যাপারটা তাঁর বিশেষ ধাতে-টাতে সয় না।

প্রাণ খুলে গাইছিলেন নীলমণি, অনেকেই চোখের জল মুছছিলেন। ভারতচন্দ্রেরও একটুখানি আচ্ছন্নতা এসেছিল। মহারাজ একবার নড়ে বসলেন, তারপর ভ্রূকুটি করলেন।

'ওহে ভারত।'

তটস্থ হয়ে ভারতচন্দ্র বললেন, 'আজ্ঞা করুন।'

'কেমন যেন জমছে না হে।'

'আজ্ঞে, ভালোই তো গাইছেন।'

'নীলমণি ভালোই গায়, ও সুর করে চরক-সংহিতা পড়লেও লোকের চোখে জল আসবে। কিন্তু বড্ড নিরামিষ হে! কবিকঙ্কণের ওই এক দোষ—ভারী শুকনো!'

ভারতচন্দ্র চুপ করে রইলেন।

মহারাজ বলে চললেন, 'দুঃখ কর অবধান, আমানি খাবার গর্ত দেখ বিদ্যমান! এই সবই কবিকঙ্কণের হাতে খোলে ভালো। আসলে মুকুন্দরাম চাষাভুষো ছোটলোকের কবি, গরিবের দুঃখের কথা শুনিয়ে কান ঝালাপালা করে দেয়। আদিরস যেটুকু আছে নেহাৎ জোলো, নিতান্তই নিয়ম রক্ষা করতে হয়, তাই লেখা। তারপর বছর বছর শুনতে শুনতে এখন কেমন একঘেয়েও লাগে।'

ভারতচন্দ্র শুনতে লাগলেন।

একটা হাই তুলে মহারাজ বললেন, 'তুমি তো খুচরো কবিতা লিখেই চালাচ্ছ। কখনো একটুখানি বসন্ত-বর্ণনা শোনালে, কখনো বা হিন্দী-ফার্সী-বাংলা-সংস্কৃত মিশিয়ে খানিকটা ইয়ার্কি করলে!'—মহরাজ আরক্তিম চোখ দুটো আধ বুজে একটু হাসলেন, 'তা এসব তোমার হাতে জমে বেশ! ভুয়ো ভুয়ো রোরুদসি ইয়াকৎ নর্মদা যাঁ কোসি—হা—হা—হা!'

মহারাজা শব্দ করে হেসে উঠলেন। কণ্ঠাভরণের গান একবার হোঁচট খেল, ঘরসুদ্ধ লোক দৃষ্টি ফেলল এদিকে, ফিরিঙ্গি বণিকেরা নিজেদের ভেতরে কী যেন কানাকানি করলেন, আর ভারতচন্দ্র অত্যন্ত অপ্রতিভ হয়ে গেলেন।

মহারাজাও যেন লজ্জা পেয়ে চুপ করে রইলেন।

কিছুক্ষণ গান চলল। তারপরেই আবার চাপা গলায় ডাক এল : 'ভারত!'

'আজ্ঞা করুন।'

'নাঃ, এ নিতান্তই পান্‌সে। এই চৌতিশায় মন ভরে? আর ভাবো দিকি বিল্‌হণের "চৌর পঞ্চাশিকা"র সেই স্তুতি? শ্মশানে মরতে বসেছে, তবু কী বুকের পাটা!

অদ্যাপি তাং শশিমুখীং নবযৌবনাঢ্যাং।
পীনস্তনীং পুনরহং যদি গৌরকান্তীম্‌।
পশ্যামি মন্মথশরাসন পীড়িতাঙ্গীং
গাত্রাণি সংপ্রতি করোমি সুশীতলানি।—

এ না হলে আর শ্মশান স্তব!'

আবার একটা তিক্ত বিস্বাদে ভারতচন্দ্রের সমস্ত মন বিরস হয়ে উঠল। তবু হাসতে চেষ্টা করতে হল, তবু সায় দিতে হয় রাজার কথায়। রাজবয়স্য আর কী করতে পারে এ ছাড়া!

'আজ্ঞে হাঁ, মহারাজ ঠিকই বলেছেন।'

'তাহলে তুমিই ভার নাও এবার। এ-সব পুরোনো চণ্ডী কাব্য আর নয়—মা-কে নিয়ে নতুন মঙ্গলকাব্য লিখে ফেলো একখানা।'

'মঙ্গলকাব্য!'

'হাঁ, সম্পূর্ণ কাব্য। এ-সব টুকরো কবিতা লিখে কেবল নিজের প্রতিভারই অপচয় করছ তুমি।'

'আমি পারব মহারাজ?'

'কেন পারবে না? তুমি রসিক, তুমি পণ্ডিত, অলঙ্কার শাস্ত্র তোমার মুঠোয়, তার ওপর স্বভাবকবি। মুকুন্দরাম কোথায় দাঁড়াবে তোমার কাছে?'

'ও কথা বলবেন না মহারাজ, কবিকঙ্কণ আমাদের নমস্য। তবে আপনি যখন আদেশ করছেন, আমি চেষ্টা করব।'

'চেষ্টা তোমায় করতে হবে না, সরস্বতী নিজে এসে তোমার কলমে ভর করবেন। কিন্তু মনে রেখো, সরস হওয়া চাই। আর দেখছ তো, আমার কৃষ্ণনগরের লোক এমনিতেই একটু বেশি রসিক, তাদেরও খুশি করা চাই।'

'মহারাজের আদেশ শিরোধার্য।'

॥ নয় ॥

'বাগর্থাবিব সংপৃক্তৌ বাগর্থ-প্রতিপত্তয়ে,
জগতঃপিতরৌ বন্দে পার্বতী-পরমেশ্বরৌ—'

কালিদাসকে স্মরণ করেই লেখনী ধরা যাক। সেই সঙ্গে মনে পড়ল মুসলিম কবির কথাও :

'ইলাহী দে মুঝে রংগীন বয়ানী,
আতা কর মুজকো ইয়াকুতে মানী—'

হে ঈশ্বর, দাও আমাকে বর্ণোজ্জ্বল ভাষা,
সেই সঙ্গে দাও তার জ্যোতির্ময় অর্থ।

কবির অন্তরের চিরন্তন প্রার্থনা।

কিছুক্ষণ মগ্ন হয়ে ভারতচন্দ্র চেয়ে রইলেন মাধবীলতার কুঞ্জটির দিকে। টুনটুনিদের বাসায় দুটি বাচ্চা হয়েছে, একটু একটু করে মা-বাবার সঙ্গে উড়তে শিখছে তারা। লীলাকে মনে পড়ে গেল, ঘর-সংসার করবেন বলে তাঁকে আশ্বাস দিয়ে এসেছেন—কিন্তু এখনো কোনো ব্যবস্থাই করা গেল না। মহারাজের কাছে কিছু জমিজমা চাইলে কেমন হয়! কিন্তু প্রবৃত্তি হয় না। চাটুকারিতার লজ্জাই যথেষ্ট, ভিক্ষার ঝুলি পেতে দরকার নেই আর।

কাগজের ওপর বড়ো বড়ো করে লিখলেন, 'চণ্ডীমঙ্গল।'

না, চণ্ডীমঙ্গল নয়। রঘুনন্দন মিত্তিরের কাছারী বাড়ি মনে পড়ে গেল। ক্ষুধিত তৃষ্ণার্ত একদল মানুষ, একটুখানি জল খেতে চাইলে রাজার পেয়াদা তাদের লাথি মারে। দেবী কি কেবল রাজা-রাজড়ারই দেবতা, গরিবের কেউ নন? নামটা কেটে দিলেন, তারপর লিখলেন, 'অন্নদামঙ্গল।'

' অন্নদা। যিনি মা। যিনি সকলকে অন্ন দেন।

কিন্তু তাঁর কথাই কি লিখতে পারবেন? সে অপরাধেই তো মুকুন্দরাম বাতিল হয়ে গেলেন। গরিবের ক্ষুধার কথা তো রাজা শুনতে চান না। তাঁর বিরক্তি ধরে যায়।

রসিকতাই করতে হবে তাঁকে। রাজা রসিক, কৃষ্ণনগরের লোকে রসিকতাই পছন্দ করে।

'ঠাকুরমশাই!'

চমকে চোখ তুললেন ভারতচন্দ্র।

'কে? চন্দ্রাবলী?'

'তোমাকে প্রণাম করতে এলুম।'—দাওয়ার ওপর ভারতচন্দ্রের পায়ের কাছে এক মুঠো শেফালী ফুল ছড়িয়ে দিয়ে প্রণাম করল চন্দ্রাবলী। স্নিগ্ধ একটা পবিত্র গন্ধে ভরে উঠল চারদিক।

'ফুলগুলো আমার পায়ে দিয়ে নষ্ট করলে কেন? ঠাকুরপুজোয় দিতুম।'

'আমার ফুল কি তোমার ঠাকুরপুজোয় লাগে?'

'লাগে বই কি। সেদিনও তুমি শ্বেত পদ্ম দিয়ে গিয়েছিলে, আমি রাধাকৃষ্ণের পায়ে সাজিয়ে দিলুম। ঠিক মনে হল, দেবতা খুশি হয়ে উঠলেন। তোমার নামটাই যে শ্রীবৃন্দাবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে'—ভারতচন্দ্র হাসলেন।

'আমিই যে ফুল দিয়ে গিয়েছিলুম, তুমি জানলে কী করে?'

'বিগ্রহ তুমি দিয়েছ, ফুল তুমি ছাড়া আর কে দেবে?'—ভারতচন্দ্রের চোখের দৃষ্টি নিবিড় হয়ে এল। আজও স্নান করে এসেছে চন্দ্রাবলী, ভিজে চুল মেলে দিয়েছে পিঠের ওপর, হাল্কা চন্দনের গন্ধ আসছে হাওয়ায়। বিদ্যাধরীর সঙ্গে মিল আছে মেয়েটির, ঠিক চিনতে পারা যায়।

চন্দ্রাবলী নিঃশ্বাস ফেলল। বললে, 'তুমি বোধহয় কবিতা লিখছিলে ঠাকুর, আমি এসে বিরক্ত করলুম। যাই।'

'না, বোসো একটু। বোসো ওই সিঁড়িতে। তুমি থাকলে আমার ভালো লাগে।'

চন্দ্রাবলী যেন শেষ কথাটায় শিউরে উঠল একবার, যেন মুখের ওপর দিয়ে রক্তের ছোট একটা ঢেউ খেলে গেল, যেন বুকে তুফান ছুটল একটুখানি। চকিত-উজ্জ্বল চোখের দৃষ্টি ছুটে গেল ভারতচন্দ্রের দিকে। না—সে মুখ শিশুর মতো সরল আর নিষ্পাপ।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে কুণ্ঠিতভাবে সিঁড়ির ওপর বসে পড়ল চন্দ্রাবলী। টুনটুনির বাচ্চা দুটো একটু বড়ো হয়ে উঠেছে, উড়ে উড়ে ফিরছে মাধবীলতা কুঞ্জের চারপাশে। চন্দ্রাবলী কিছুক্ষণ চেয়ে রইল সেদিকেই। হাওয়ায় ভাসছে ফুল আর চন্দনের গন্ধ। নিজের ওপরে তার ধিক্কার এল। কী দুর্বল মানুষের মন। এমন পরিবেশের ভেতরেও তার রক্ত-মাংসের চঞ্চলতা বাধা মানে না—যা অসম্ভব, তারই জন্যে অনর্থক ব্যাকুল হয়ে ওঠে!

'চন্দ্রাবলী।'

চমকে নড়ে উঠল চন্দ্রাবলী। শেষ রাতের চাঁদের আলো যেমন করে দীঘির কালো জলের ওপর কাঁপতে থাকে, ডাকটা তেমনি ভাবে তার বুকের ভিতরে থরো-থরো করে দুলতে লাগল খানিকক্ষণ। একটু সামলে নিয়ে জবাব দিলে সে।

'বলো, ঠাকুর।'

'তোমার বাড়ি এখানেই?'

'না—নবদ্বীপে।'

'এখানে কেন এলে এভাবে?'

চন্দ্রাবলী সহজ হল এতক্ষণে, হাসল।

'এই যে আমাদের পেশা, ঠাকুর-মশাই। মা-রও এই কাজ ছিল। ছেলেবেলায় কীর্তন গাইতুম মনোহরশাহী, গরানহাটি, রেনেটি। এখন বিশ্রাম খাঁ সাহেবের কাছে টপ্পা-গজল শিখি, নাচ শিখতে হয় শের মামুদের কাছে।'

'কীর্তন শোনবার লোক নেই কৃষ্ণনগরে?'

চন্দ্রাবলী বিষণ্ণভাবে বললে, 'মহারাজ যে পরম শাক্ত। এমনিতে অবশ্য তাঁর রাজ্যে কোনো অত্যাচার নেই, কিন্তু মনে মনে তিনি আদৌ পছন্দ করতে পারেন না বৈষ্ণবদের। নবদ্বীপে, যেখানে স্বয়ং মহাপ্রভুর জন্মস্থান, তাঁর লীলা, সেখানেও এখন শাক্তদেরই প্রতিপত্তি। এমন কি দোল-পূর্ণিমায় মহাপ্রভুর আবির্ভাবের দিনে পর্যন্ত বৈষ্ণবদের নগর-সংকীর্তন বের করবার জো নেই, শাক্তেরা নরমুণ্ডের মালা গলায় দুলিয়ে খড়্গ হাতে তাড়া করে আসে।' —চন্দ্রাবলী একটু চুপ করে রইল: 'কিন্তু সেদিন দেখলুম, তুমি যুগল-মূর্তিটির দিকে যেমন একভাবে চেয়ে আছো, চিনতে পারলুম ভক্তের চোখ। নইলে কি সাহস করে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভার কবির হাতে আমি রাধাকৃষ্ণকে তুলে দিতে পারতুম?'

'আমি শাক্ত না বৈষ্ণব নিজেই জানি না।'—ভারত দীর্ঘশ্বাস ফেললেন: 'শাক্তের বংশে জন্মেছি, জীবনের অর্ধেক কেটে গেল বৈষ্ণবের সঙ্গে। আমার চোখে শ্যাম-শ্যামা এক হয়ে মিশে যায়, আমি কোনো তফাৎ দেখি না।'

'তোমরা অনেক উঁচুতে উঠেছ ঠাকুর, তোমাদের কথা আলাদা। আমরা সামান্য প্রাণী, আমাদের এ-সব অভেদ জ্ঞান জন্মায় না।'

'আমিও অন্ধকারেই বাস করছি চন্দ্রাবলী, কোনো সত্যের খবরই এ পর্যন্ত পাইনি।'—ভারত একবার থামলেন, তারপর বললেন, 'এই শাক্ত রাজার সভায় তোমাকে নাচতে হয়, গান গাইতে হয়, ভালো লাগে তোমার?'

'তখন মনে মনে ভাবি—সর্বং কৃষ্ণময়ং জগৎ। আর মহারাজার নামই তো তাঁরই নাম। তখন শ্যাম আর শ্যামার ভেতরে অভেদ হয়ে যায়। ফার্সী গজল মিলে যায় ভাবসম্মিলনে। তখন মানুষের জন্যে যে গান গাই, তা দেবতার পায়ে গিয়ে পৌঁছোয়। নাচতে নাচতে মনে হয়, আমি তো দেবদাসী, আমার সামনে সব চোখগুলো পুরুষোত্তমের চোখে হারিয়ে যায়, রবাব তবলার বাজনায় আমি শ্রীমন্দিরের মৃদঙ্গ শুনি।'

নিস্তব্ধ চোখে ভারতচন্দ্র চন্দ্রাবলীর দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর:

'চন্দ্রাবলী, এর পর থেকে তোমার প্রণাম তো আর আমি নিতে পারব না।'

'ছি ছি, এমন করে আমাকে আর লজ্জা দিয়ো না ঠাকুর। এমনিতেই তো

পাপে ডুবে আছি, তোমাকে দেখলে তবু কিছুক্ষণের জন্যে সব পবিত্র হয়ে যায়। মাঝে মাঝে এসে চরণ-দর্শন করে যাব, তাতে আর তুমি বাধা দিয়ো না।'

'কিন্তু চন্দ্রাবলী, আমি তো সাধারণ মানুষ। বাসনা-কামনার অন্ত নেই, পুণ্য বলতে জীবনে কিছুই করিনি। আমাকে কেন প্রণাম করে যাও তুমি? কী লাভ হয় তোমার?'

চন্দ্রাবলী হাসল।

'আমার লাভ-ক্ষতির কথা জেনে তোমার কী হবে? আমি তোমাকে কী চোখে দেখি, কেন প্রণাম করি, সে সবও তুমি না-ই বা শুনলে। শুধু পায়ে ঠেলো না, এইটুকুই মিনতি রইল।'

সিঁড়ির ওপরে আর একবার প্রণাম রেখে চন্দ্রাবলী চলে গেল।

ভারতচন্দ্র মগ্নমৌনী হয়ে বসে রইলেন কিছুক্ষণ। পায়ের কাছে এক মুঠো শাদা শেফালী ফুলের অঞ্জলি। বাতাসে এখনো যেন চন্দনের সুগন্ধ মূর্ছিত হয়ে আছে। চন্দ্রাবলী তাঁর কাছ থেকে কী পায় কে জানে, কিন্তু আজকের সকালটিকে তাঁর পূর্ণ করে দিয়ে গেল।

আজই কাব্য আরম্ভ করবার সব চেয়ে শুভদিন। এমন লগ্ন আর আসবে না।

কয়েক লহমা নিজের ভেতরে মগ্ন হয়ে থেকে লিখতে আরম্ভ করলেন :

"গণেশায় নম নমঃ আদিব্রহ্ম নিরুপম
পরমপুরুষ পরাৎপর।
খর্বস্থূল কলেবর গজমুখ লম্বোদর
মহাযোগী পরমসুন্দর॥
বিঘ্ননাশ কর বিঘ্নরাজ।
পূজা হোম যোগ যাগে তোমার অর্চনা আগে
তব নামে সিদ্ধ সব কাজ—"

বন্দনার পরে ভারতচন্দ্রের কলম থামল। এইবারে কাহিনী শুরু করতে হবে।

কিন্তু কার কাহিনী? রাত্রে ঘুম আসে না—বিনিদ্র প্রহরগুলো নানা ভাবনার মধ্য দিয়ে পার হয়। কালকেতুর গল্প মহারাজ শুনতে চান না, গরিবের দুঃখের কথা তাঁর আর ভালো লাগে না। ধনপতি-শ্রীমন্ত সওদাগরের গল্প? মজা সরস্বতীর ধারে ধীরে ধীরে মরে আসছে ত্রিবেণী-সপ্তগ্রামের বন্দর, বাঙালী সওদাগর আর সাহস করে বহর নিয়ে পাটনে বেরোয় না। হার্মাদে মগে লুঠ করে নেয় জাহাজ, ফিরিঙ্গিরা সুযোগ পেলে ছাড়ে না।

আর বর্গী? সে আর কিছু দেশে রাখেনি। চাষী মাঠ ফেলে পালিয়েছে, তাঁতী তাঁত ছেড়ে উধাও হয়েছে, ব্রাহ্মণের পুঁথির পাতা হাওয়ায় উড়ছে। ক্ষেতে আগাছার জঙ্গল, তাতে ইঁদুরের বাসা—ধান নেই—চাল নেই, ব্যবসা নেই,

অর্ধেক সুবে বাংলার এই চেহারা।

ফরাসডাঙা, চুঁচুড়া, কলকাতায় নতুন কুঠি, নতুন ঐশ্বর্য। বর্ধমান-কৃষ্ণনগরে রাজারা মোচ্ছব করেন, সেপাইসান্ত্রী লোক-লস্কর নিয়ে তাঁদের দিন এক রকম সুখেই কাটে। কিন্তু ভারতচন্দ্র আর এক দেশকে দেখছেন; ধর্মে বিশ্বাস নেই, চোর-ডাকাতের হাতে ভরসা নেই, সন্ন্যাসী-কাপালিকের উপদ্রবে একদিনের জন্যে স্বস্তি নেই। খেউড় গান আর উচ্ছৃঙ্খলতা, পরকীয়া সাধনার নামে বেপরোয়া ব্যভিচার, তন্ত্রের নামে নরবলি-নারীহরণ। আর সব কিছু ছাপিয়ে আকাল—শুধু আকাল! চালের দাম আকাশ-ছোঁয়া; দেশে কাপড়-চোপড় যা তৈরী হয়, ফিরিঙ্গী বানিয়ারা বেশি দাম দিয়ে তা কিনে নেয়—গরীব মানুষ প্রায় বিবস্ত্র হয়ে-দিন কাটায়। তারই ভেতরে রঘুনন্দন মিত্রের আখ্‌-পেষাইয়ের জাঁতা ঘুরে চলেছে, দেবতার নৈবেদ্যে এক মণ ওজনের সন্দেশটিতে এক ছটাকও কম পড়ে না।

ভাবতে ভাবতে চোখ বুজে এল। ছেলেবেলার একটা অস্পষ্ট স্মৃতি। পেঁড়োরগড়ের সর্বস্ব লুঠ করে নিয়ে গেছেন কুপিতা মহারানী বিষ্ণুকুমারী। এক মুঠো চালের পর্যন্ত সংস্থান নেই।

বাবা, দাদারা পলাতক। রাজরানী মা ধুলোয় বসে। চোখ দিয়ে তাঁর জল পড়ছে।

'কী খেতে দেব তোদের? কী করে তোদের আমি বাঁচাব?'

লোকে মাকে বলত অন্নপূর্ণা। অতিথির সেবার জন্যে সব সময় খোলা থাকত বাড়ির দরজা। সেই অন্নপূর্ণা আজ ভিখারিণী।

মনে হল যেন মা সামনে এসে দাঁড়ালেন।

'কী খেতে দেব তোদের? কেমন করে তোদের আমি বাঁচাব?'

চকিতে চোখ মেললেন ভারতচন্দ্র। এই কি স্বপ্নাদেশ? স্বয়ং অন্নপূর্ণাই কি মায়ের রূপ ধরে এসে তাঁকে পথ দেখিয়ে দিয়ে গেলেন?

বাইরে পাখির কলকাকলি। প্রথম ভোরের আলো এসেছে ঘরে। ভারতচন্দ্র উঠে বসলেন। সেই অস্পষ্ট আলোতেই টেনে নিলেন কাগজ কলম, যেখানে শেষ করেছিলেন, তার শেষে জুড়ে দিলেন :

"স্বপনে রজনী শেষে বসিয়া শিয়র দেশে
কহিলা মঙ্গল রচিবারে।
সেই আজ্ঞা শিরে বহি নূতন মঙ্গল কহি
পূর্ণ কর চাহিয়া আমারে—"

দুর্গোৎসবের পালা শেষ হয়েছে, কিন্তু উৎসবের জের মেটেনি। সামনে কালীপূজা। মহারাজের ইষ্টদেবীর পূজা। সেদিন আর এক বিপুল সমারোহ। আগমবাগীশের বংশধর আসবেন নবদ্বীপ থেকে, তিনিই বসবেন পুরোহিতের

আসনে, রাজা হবেন তাঁর তন্ত্রধার। সমস্ত কৃষ্ণনগর তৈরী হচ্ছে তার জন্যে। এখন থেকেই বাজি পুড়তে আরম্ভ হয়েছে। পুজোর দিনে আকাশ জুড়ে শুরু হবে আগুনের খেলা। রাজবাড়ির জন্যে লক্ষ টাকা বাজির ফরমাস গেছে, তৈরী করবে কলকাতার এক ফিরিঙ্গি কারিগর। শহর লোকে লোকারণ্য। দেশ-বিদেশ থেকে অসংখ্য মানুষ এসেছে, এসেছে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের দল, এসেছে জুয়াড়ী, এসেছে ভিখারী, এসেছে বারাঙ্গনা। ষোলো পাক সরভাজার গন্ধে বাজারের বাতাস উতরোল, পুতুলের দোকানে রঙের হাট বসেছে।

মহারাজের দান-ধ্যানের তুলনা নেই, এই সময় তাঁর উদারতার অন্ত থাকে না। কোনো প্রার্থী বিমুখ হয় না, পণ্ডিতদের অকাতরে ব্রহ্মত্র বিতরণ করেন। রাজার জয়ধ্বনিতে কৃষ্ণনগর কাঁপতে থাকে। এবারেও সব এক রকম। কিন্তু রাজার মনে শান্তি নেই।

শান্তি নেই রাজবল্লভের জন্যে।

একটা নিঃশব্দ অন্ধকারের স্রোত বইছে মুর্শিদাবাদে। নবাব ক্রমশ অথর্ব আর অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। কিন্তু তিনি যে কী চান, সে-কথা কারো আর অবিদিত নেই। মীর্জা মামুদই বাংলার নবাব হবে।

সেটা ভয়ের কথা। তার চাইতেও ভাবনার কথা রাজবল্লভ।

মীর্জা মামুদ নবাব হলে তাঁরই সর্বনাশ হবে সকলের আগে। যে পাপে হোসেন কুলি খাঁর মতো বিচক্ষণ বুদ্ধিমান লোককেও কুকুরের মতো রাস্তায় প্রাণ হারাতে হয়েছে, সে পাপে রাজবল্লভেরও নিষ্কৃতি নেই। দাঁতে দাঁত চেপে সুযোগের অপেক্ষা করছে মীর্জা মামুদ। রাজবল্লভ জানেন, হোসেন কুলি তলোয়ারের মুখে প্রাণ হারিয়েছেন; তাঁর মাংস ডালকুত্তায় ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে। সুতরাং মীর্জা মামুদকে শেষ করতেই হবে রাজবল্লভকে। কাঁটা তোলবার জন্যে হয় নওয়াজেস মহম্মদ না হয় পূর্ণিয়ার শওকৎ জঙ্গ। নওয়াজেসের শক্তি-সামর্থ্য যাই থাক, ঘসেটি বেগমের বিরুদ্ধে যাওয়ার সাহস তার নেই। আর শওকৎ জঙ্গ? চরিত্রহীন, অকর্মণ্য, বিলাসী। যেই নবাব হোক, রাজবল্লভ হাতের পাঁচ আঙুলে তাদের পুতুলের মতো নাচাতে পারবেন।

তারপর—

তারপর নিষ্ঠুর স্বার্থপর রাজবল্লভের অত্যাচারে দেশের একটি জমিদারেরও আর চোখে ঘুম থাকবে না।

মুসলমান নবাব প্রজাদের ওপর উৎপাত করে না তা নয়; কিন্তু হিন্দু জমিদারদের সব অন্ধি-সন্ধি তারা জানে না, জানতেও চায় না; নিয়মিত রাজস্ব দিলে, বিদ্রোহ-চক্রান্ত না করলে, যুদ্ধ-বিগ্রহের সময় কিছু সেনা-সামন্ত পাঠালেই তারা খুশি থাকে, খেতাব-খেলাৎ দেয়। কিন্তু হিন্দুর হাত থেকে অত সহজে নিস্তার নেই। সে সব জানে, সব বোঝে; দেবত্র-ব্রহ্মত্রকেও সে ছেড়ে কথা কইবে না। হিন্দু যদি হিন্দুকে দেখত, তা হলে পরম শৈব বর্গীর

উৎপাতে এমন করে দেশ মহাশ্মশান হয়ে যেত না। তার ওপর স্বয়ং রাজবল্লভ যদি একবার ক্ষমতা হাতে পায়—

কৃষ্ণচন্দ্র ভাবছিলেন আর অস্থিরভাবে পায়চারী করছিলেন। শেষ পর্যন্ত বিরক্ত হয়ে কন্দর্প সিদ্ধান্তকে ডেকে পাঠালেন। তাঁর নানা মেজাজে নানা সঙ্গী। তর্কসিদ্ধান্ত কিংবা বাচস্পতির সঙ্গে যখন ন্যায়শাস্ত্র নিয়ে আলোচনা করেন, তখন তাঁর এক রূপ; যখন বাণেশ্বরের সঙ্গে সংস্কৃতকাব্য রচনা করেন, তখন তাঁর আর এক চেহারা; বিশুদ্ধ ইয়ার্কীর দরকার হলে গোপাল ভাঁড়, ভারতচন্দ্রেরা আছেন। কন্দর্প সিদ্ধান্তও এই রকম একটি বিশেষ মুহূর্তের প্রয়োজন।

'স্মরণ করেছেন মহারাজ?'

'ওহে সিদ্ধান্ত, আর তো ভালো লাগছে না। মেজাজ ভারী খারাপ।'

'মহারাজ, গোপাল ভাঁড়কে খবর দেব কি?'

'না, ওটা এখন থাক। ওকে আপাতত সহ্য করা যাবে না, অত মোটা রসিকতা শোনবার মতো মনের অবস্থা আমার নয়। তোমার সঙ্গে কিছু রসালো পুঁথিটুঁথি আছে নাকি হে? পড়ে শোনাও।'

সিদ্ধান্ত হাসলেন: 'আজ্ঞে, আমি বিহ্লণ সঙ্গে করেই এনেছি।'

'বটে—বটে! পড়ো তা হলে। ভালো কথা, ভারতচন্দ্রের খবর কী?'

'আজ্ঞে মহারাজের আদেশে সে মঙ্গলকাব্য রচনা করছে।'

'তা করুক। কিন্তু লোকটা ভারী নিষ্ঠাবান আর ধার্মিক হে। কবিত্ব শক্তি আছে বটে, কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে, ঠিক আর একখানা কবিকঙ্কণ চণ্ডী দাঁড় করাবে। সে যাক, তুমি পড়ো।'

'রাজকন্যার রূপ বর্ণনা দিয়েই শুরু করি মহারাজ?'

'তাই করো।'

পুঁথি খুলে কন্দর্প পড়তে আরম্ভ করলেন:

> কিমিন্দুঃ কিম্পদ্মঙ্কিকসু মুকুরবিম্ব কিঙমু মুখং
> কিমব্জে কিম্মীনৌ কিমু মদনবাণৌ কিমুং দৃশৌ।
> খগৌ বা গুচ্ছৌ বা কনককলসৌ বা কিমু কুচৌ
> তড়িম্বা তারা বা কনকলতিকা বা কিমবালা।"

রাজা বললেন, 'বেশ, বেশ। তা সংশয়ের নিরসন হল কী করে?'

কন্দর্প মৃদু হেসে পড়ে চললেন:

> "নেদং মুখন্দৃগবিমুক্ত শশাঙ্কবিম্বং
> নেমৌ স্তনাবমৃতপূরিতহেমকুম্ভৌ।
> নৈবালকবলিরিয়স্মদনাস্ত্রশালা
> নৈবেদমক্ষিযুগলং নিগলং হি ঘৃণাং—"

রাজা বললেন, 'তবু তো সন্দেহ রয়েই গেল। এখনো সম্পূর্ণ মানবী কিনা বোঝা যাচ্ছে না।'

'কামীর সংশয় কি অত সহজে নিবৃত্ত হয়, মহারাজ? তারপর শুনুন—"ধ্বান্তানাম্ পটলং সুধাংশুসকলঙ্কোদণ্ডমিন্দীবরে, পত্রঙ্কোকনদস্য কম্বুলাতকে—"

সেই সময় ভারতচন্দ্রের বাসায় চন্দ্রাবলী ডাকল : 'ঠাকুর।'

ভারতচন্দ্র লিখছিলেন। খাগের কলমটি দোয়াতে ডুবিয়ে রেখে বললেন, 'এসো।'

'আরে। তোমার লেখা নষ্ট করে দিলুম তো?'

'তুমি এলে আমার লেখা নষ্ট হয় না, প্রাণ পায়।'

'ছি-ছি, কী যে বলো। মিথ্যে শুধু পাপ বাড়াচ্ছ আমার।'—আঁচল থেকে আজ কয়েকটি পদ্মের কুঁড়ি বের করল চন্দ্রাবলী :

'আজ তোমার জন্যে এই ক'টি মাত্রই পেলুম। পুজোর হিড়িকে পদ্মবন খালি হয়ে গেছে, যে দু-চারটি আছে, হিমের ছোঁয়ায় তারাও ঝরতে শুরু করে দিয়েছে।'

'তা যাক।'—ভারতচন্দ্র স্নিগ্ধ হাসি হাসলেন : 'তোমার মনের পদ্মে যে অর্ঘ্য সাজিয়ে দিচ্ছ, তাই নিয়েই দেবতা খুশি হবেন। কিন্তু ও ফুল ক'টি আর আমার পায়ে দিয়ো না, রাখো এখানে।'

'আমি তোমাকে দিলুম। তাতেই আমার তৃপ্তি। তুমি যা খুশি করো। কিন্তু আমি যাই—তোমার লেখা নষ্ট করবো না।'

ভারতচন্দ্র বললেন, 'না না, বোসো একটু। তুমি এলে আমার ভালো লাগে।'

একবারের জন্যে আলো হয়ে উঠেই চন্দ্রাবলীর মুখে আবার ছায়া ঘনালো : 'আমি এলে তোমার ভালো লাগে? কিন্তু আমি তো পাপিষ্ঠা।'

'দেবদাসীর পাপ-পুণ্যের বিচার তার দেবতা করবেন, আমি কে?'—ভারতচন্দ্র গভীর দৃষ্টিতে চন্দ্রাবলীর মুখের দিকে চাইলেন : 'তোমার ভাবনা যিনি ভাববার তিনিই ভাবছেন। কিন্তু সত্যিই বলছি, তোমাকে দেখলে আমার মন প্রেরণা পায়।'

চন্দ্রাবলী মুখে আঁচল দিয়ে হেসে উঠল।

'ঠাকুর, জিতেন্দ্রিয় বলে তোমার খ্যাতি আছে। এ-কথা শুনলে লোকে কী বলবে?'

'যা খুশি বলুক। আমার সত্য আমার কাছে।'

'ব্রাহ্মণী এখানে নেই বলেই বুঝি এত সাহস?'

ব্রাহ্মণী! লীলার কথায় কয়েক মুহূর্তের জন্যে উদাস হলেন ভারতচন্দ্র। তারপর হাসলেন।

'না, ব্রাহ্মণীও আমায় ঠিক বুঝবে। জানো, তোমার নাম যদি চন্দ্রাবলী না হতো, আমি ওটাকে পাল্‌টে দিতুম। তোমাকে ডাকতুম মালিনী বলে।'

'মালিনী? বেশ তো, তোমার যে নামে খুশি ডেকো।'—চন্দ্রাবলীর চোখ জ্বল জ্বল করে উঠল : 'কিন্তু মালিনী কেন?'

'বোসো তবে ওখানে, বলি।'

সেই দূরত্ব বাঁচিয়ে, সসম্ভ্রমে সিঁড়ির ওপর বসে পড়ল চন্দ্রাবলী। ভারতচন্দ্র বললেন, 'মহাকবি কালিদাসের নাম শুনেছ তুমি?'

'শুনেছি।'

'সেই মহাকবিকে মালিনী রোজ ফুল এনে দিত।'

'আমার মতো?'

'হাঁ, ঠিক তোমার মতো। আর কবি তাকে নিজের লেখা কবিতা শোনাতেন। আমিও তোমাকে শোনাব আজ থেকে।'

চন্দ্রাবলী হাসল : 'কিন্তু আমি বুঝতে পারব কেন?'

'তুমি সবই বুঝতে পারবে। আর আমার কবিতা তো পণ্ডিত মশায়দের জন্যে লেখা নয়, সকলের জন্যেই।'

'তা হলে মালিনী বলেই ডেকো আমাকে।'

'না, তা হয় না। তুমি কৃষ্ণপ্রিয়া, তোমাকে কি আমার কুঞ্জের মালিনী করতে পারি?'—ভারতচন্দ্র হাসলেন : 'শিবের ঘরকন্নার কথা লিখছিলুম। পড়ব একটুখানি?'

'আমার ভাগ্য।'

খাতা খুলে ভারতচন্দ্র পড়তে লাগলেন :

"শঙ্কর কহেন শুন শুনহ শঙ্করি।
ক্ষুধায় কাঁপয়ে অঙ্গ বলহ কি করি॥
নিত্য নিত্য ভিক্ষা মাগি আনিয়া যোগাই।
সাধ করে একদিন পেট ভরে খাই ॥
সকলের ঘরে ঘরে নিত্য ফিরি মেগে।
সরম ভরম গেল উদরের লেগে॥
ভিক্ষা মাগি ভিক্ষা মাগি কাটালাম কাল।
তবু ঘুচাইতে নারিলাম বাঘছাল—"

ভারতচন্দ্র থামলেন : 'খুব নীরস, না?'

'রসের আমি কী জানি, ঠাকুর? কিন্তু এ কোন্ শিবের কথা তুমি বলছ? যিনি ত্রিভুবনের ঈশ্বর, এই কি তাঁর সংসারের দশা? কুবের স্বয়ং যাঁর ভাণ্ডারী,

তাঁকেও কি এমন করে পেটের দায়ে দোরে দোরে ভিক্ষে করতে হয়?'

'তাই তো হয়, চন্দ্রাবলী। এই তো আমাদের বাংলা দেশের শিবের দশা। নিজের চোখেই তাঁর সে দুর্গতি আমি দেখেছি।'

'এই কবিতা মহারাজের ভালো লাগবে?'

'জানি না। বোধহয় লাগবে না। কিন্তু যত চেষ্টাই করছি, সব ঐশ্বর্য মূর্তির আড়াল থেকে আমার এই ভোলানাথই বেরিয়ে আসতে চান বার বার। কী করব চন্দ্রাবলী?'

'তোমায় কিছুই করতে হবে না ঠাকুর। যিনি তোমাকে দিয়ে লেখাচ্ছেন, তাঁর কথা তিনি নিজেই বলবেন। তুমি তো নিমিত্ত মাত্র। আচ্ছা, আসি আজ, অনেক বেলা হল। প্রণাম।'

চন্দ্রাবলী চলে গেল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে নিঃশ্বাস ফেলে আবার কলম হাতে তুলে নিলেন ভারতচন্দ্র। মহারাজকে খুশি করবার ওপর সমস্ত ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। কিছু জমি-জমা, একটি বাসস্থান, লীলাকে নিয়ে আবার নতুন করে সংসার পাতা। এক বছর হতে চলল, এখনো কিছুই করতে পারেন নি। কাব্য লিখে মহারাজকে তুষ্ট করতে পারলে সব ঠিক হয়ে যেত।

কিন্তু তাঁর ইচ্ছেতেই কি সব? 'যিনি তোমাকে দিয়ে লেখাচ্ছেন, তাঁর কথা তিনি নিজেই বলবেন। তুমি তো নিমিত্ত মাত্র।' ঠিক। স্বেচ্ছায় তাঁর কিছুই করবার নেই। একবার গানে লিখেছিলেন, 'নিত্য তুমি খেল যাহা, নিত্য ভাল নহে তাহা, আমি যা খেলিতে বলি, সে খেলা খেলাও হে।'

এ তো অহঙ্কারের কথা। মানুষের ইচ্ছা দিয়ে কি তাঁকে চালানো যায়? অন্তরের আড়ালে বসে সবই তো তিনিই নিয়ন্ত্রণ করছেন : 'ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন—'

অহঙ্কার চূর্ণ হোক। দেবতাই তাঁর লেখনীতে আবির্ভূত হোন।

ভারতচন্দ্র লিখে চললেন :

"কেবা এমন ঘরে থাকিবে।
জয়া এ দুঃখ সহিতে কেবা পারিবে।
আপনি মাখেন ছাই আমারে কহেন তাই
কেবা সে বালাই ছাই মাখিবে।
দামাল ছাবাল দুটি অন্ন চাহে ভূমে লুটি
কথায় ভুলায়ে কে বা রাখিবে—"

॥ দশ ॥

কালীপূজোর উৎসব শেষ, প্রায় দেড় মাসের মত্ততার পর শহর এখন শ্রান্ত-ক্লান্ত। বিদেশের মানুষ ঘরে রওনা হয়েছে, পণ্ডিতেরা যথাসাধ্য বিদায় কুড়িয়ে রাজার জয়ধ্বনি তুলে বিদায় নিয়েছেন। পথের ভিড় হাল্কা, নাচ গানের স্রোতে ভাঁটা পড়েছে। রঘুনন্দনের কাছারীতে ভিড় নেই, সন্ন্যাসী-অবধূত-ভিখারীর দল আর তেমন করে চোখে পড়ে না; দোকান-বাজার যেন ঝিমন্ত, যে-সব নতুন দোকান বসেছিল, তারা ছাউনি তুলে চলে গেছে। শুধু পথে পথে এখনো রাজসূয় যজ্ঞের স্মৃতিচিহ্ন হয়ে শুকনো কলার পাতা হাওয়ায় হাওয়ায় উড়ে বেড়াচ্ছে। স্বয়ং মহারাজও ক'দিন আর দর্শন দেননি—না খোলা দরবারে, না খাস-বৈঠকে। তিনি বিশ্রাম করছেন।

'কৃষ্ণচন্দ্র নরপতি করিলেন অনুমতি
সেই মত রচিয়া বিধানে।
ভারত যাচয়ে বর অন্নপূর্ণা দয়া কর,
পরীক্ষিততনু ভগবানে—'

কাব্য শেষ হয়েছে ভারতচন্দ্রের। দেওয়ান গোপাল চক্রবর্তীর মুখে হুজুরে খবর পাঠিয়েছেন ভারতচন্দ্র। কিন্তু এখনো ডাক আসেনি। কিন্তু চন্দ্রাবলী এসেছে মাঝে মাঝে। কিছু কিছু শুনিয়েছেন তাকে।

'ঠাকুর, চমৎকার হয়েছে তোমার লেখা। মহারাজ খুশি হবেন।'

'অদৃষ্টই বলতে পারে সে-কথা। আমি চেষ্টা করেছি।'

'চেষ্টা কেন? সিদ্ধিলাভ হয়েছে তোমার। লোকে মহাকবি বলে চিরদিন মনে রাখবে তোমার নাম।'

'কবিতায় সিদ্ধিলাভ? মহাকবি কালিদাস পর্যন্ত আশা রাখতে পারেননি। তিনিও দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিলেন, "মন্দঃ কবিযশঃপ্রার্থী গমিষ্যাম্যুপ-হাস্যতাম, প্রাংশু-লভ্যে ফলে—" '

চন্দ্রাবলী বাধা দিয়েছিল : 'কালিদাস যা খুশি বলুন, তাঁর কথায় আমার কাজ নেই। আমি বলছি, এই কাব্য তোমার অমর হয়ে থাকবে। লোকে কোনো-দিন তোমার কথা ভুলবে না।'

তারপর রোজকার মতো সেদিনও কিছু ফুল রেখে চলে গিয়েছিল। জলের পদ্ম ফুরিয়ে গেছে, ক'টি স্থলপদ্ম। এই ফুলগুলো সে কোথা থেকে আনে

জিজ্ঞেস করতে কৌতূহল হয়। কিন্তু মুখ ফুটে কথাটা জিজ্ঞেস করতে পারেন না, কোথায় যেন সংকোচে বাধে।

আর উৎসাহ রঘুনাথের।

'কর্তা, এবার আমাদের সুদিন আসছে তা হলে।'

'তাই নাকি?'

'মহারাজা নিশ্চয় আপনাকে অনেক খেতাব-খেলাৎ দেবেন, চাইকি বড়ো-সড়ো একটা জমিদারীও দিয়ে বসতে পারেন। তখন আপনি আবার রাজা হবেন, আর আমি—'

'তোকে মন্ত্রী করে দেব।'—ভারতচন্দ্র হাসলেন।

'আজ্ঞে মন্ত্রী হওয়া ভারী ল্যাঠা, কখনো রাজা মাথায় তুলে রাখছেন, কখনো পছন্দ না হলে গর্দান নিয়ে নিচ্ছেন। ও-সব ঝঞ্ঝাটের ভেতরে আমি নেই। আমি হব আপনার খাস চোপদার। রেশমী পাগড়ি মাথায় দিয়ে, হাতে একটা রুপো-বাঁধানো লাঠি নিয়ে দুনিয়াসুদ্ধ সবাইকে কড়্কে বেড়াব।'

'বুড়ো বয়েসে শেষকালে গাঁজা ধরলি রঘু?'

'গাঁজার কী পেলেন এতে? আহা কী কবিতাই লিখেছেন—মহারাজা তো মহারাজা, শুনলে পাষাণ পর্যন্ত গলে যাবে।'

'তুই কী করে জানলি?'

রঘুনাথের অভিমান হল।

'আজ্ঞে, কী ভেবেছেন আপনি? ওই চন্দ্রাবলীকে আপনি পড়ে পড়ে শোনান আর দূরে বসে আমি কান পেতে শুনি। কী লেখাই লিখেছেন কর্তা! শিব যখন গৌরীকে বিয়ে করতে গেলেন, তখন বুড়ো বর দেখে—'

'তুই থাম্।'

'থামব কি কর্তা। এ যে একেবারে আমাদের গাঁয়ের ত্রিলোচন চাটুজ্জের বিয়ের ছবিটা এঁকে দিয়েছেন। আমি সে বিয়েতে বরের সঙ্গে গিয়েছিলুম। সত্তর বছরের বুড়ো, বিয়ে করতে গেছে কুলীনের ঘরের দশ বছরের মেয়েকে। বুড়োর মাথা থরথর করে কাঁপে, শরীর যেন অষ্টাবক্র মুনি। বর দেখেই মেয়ের মা-র সে কি আছাড়ি-পিছাড়ি কান্না। বলে, 'মেয়ে আমার সারাজীবন আইবুড়ো থাক সে-ও ভালো, কিন্তু ওই ঘাটের মড়ার হাতে দিলে তিন দিনে হাতের শাঁখা ভেঙে সিঁথের সিঁদুর মুছে ফিরে আসবে।' মেয়েকে কিছুতে আনতে দেবে না স্ত্রী-আচারে, জড়িয়ে ধরে বসে রইল। শেষে জোর করে মা-টাকে নিয়ে গিয়ে একটা ঘরে শেকল-বন্ধ করে রাখলে। সেখান থেকে তার সমানে মাথা কোটা আর চিৎকার—'

'থাম রঘু, চুপ কর। আমার ভালো লাগছে না।'

'সত্যি কর্তা, এ-সব কাণ্ড-কীর্তি দেখলে আপনাদের জাতটার ওপরেই

ঘেন্না ধরে যায়। সমাজের চুড়োর ওপর বসে রয়েছেন কিন্তু একেবারে কশাইয়ের মতো আচার-আচরণ। আপনার পাল্লায় পড়ে অনেকদিন তো বোষ্টমদের সঙ্গে কাটালুম। দেখলুম, ভণ্ডামি আছে বিস্তর, খামোকা হাউ মাউ করে কাঁদে, এক একটা ষাঁড়ের মতো কোঁদা গোসাঁই পঁচিশটে করে সেবাদাসী নিয়েও বেড়ায়; খিচুড়ি-মালপো গিলতে পারে রাক্ষসের মতো, অথচ অন্যের খিদে পেলে শুকনো হর্তুকীর গল্প শোনায়।'

ত্রিলোচন চাটুজ্জের বিয়ের কাহিনীতে চোখে জল এসে গিয়েছিল, কিন্তু শেষ কথাটা শুনে অনিচ্ছা সত্ত্বেও হেসে ফেললেন ভারতচন্দ্র।

'সেই হর্তুকীর দুঃখ দেখছি তোর এখনো যায়নি।'

'আজ্ঞে সে কি সহজে যাবার? ইচ্ছে হয়েছিল, বাবাজীর দাড়ির গোছাটা ধরে জোরে একটা টান দিই। তবু বলব কর্তা, বামুনদের চাইতে বোষ্টমরা ঢের ভালো। তারা দিনরাত লোকের হাঁড়িকুঁড়ি নিয়ে মাথা ঘামায় না, গঙ্গার ঘাটে শুয়ে শ্বাস টানতে টানতে বিয়ে করে দেশসুদ্ধ রাঁড়ী রেখে যায় না, তাদের মন নরম, পারৎপক্ষে কারুর অনেষ্ট করে না, মনে দয়া-ধর্মও আছে। আর বামুন? বাপ্‌রে, তাদের ক্ষুরে পেন্নাম!

চোখ কৌতুকে চকচক করতে লাগল, কিন্তু মুখে গাম্ভীর্য টেনে আনলেন ভারতচন্দ্র।

'ব্রাহ্মণের নিন্দে করছিস হতভাগা? নরকে যাবি।'

'যাই যাব। চিত্তির গুপ্তকে বলব, ঠাকুর, যে নরকে বামুন নেই, দয়া করে সেইখানেই ঠাঁই দিও আমাকে।'

ভারতচন্দ্র বললেন, 'তা হলে তোর আর নরকবাস অদৃষ্টে নেই। বামুন নেই, এমন নরক হতেই পারে না। বরং যেখানে যাবি দেখতে পাবি তাদের ভিড়টাই বেশি। সে যাক।—' মৃদু হেসে বললেন, 'তা ছাড়া সে-রকম নরক যদি থাকেই, আমাকে পাচ্ছিস কোথায়? আমিও তো বামুনদের—'

রঘুনাথ বাধা দিলে: 'বালাই-ষাট্! আপনার পুণ্যের শরীর, নরকে যাবেন কোন্ দুঃখে?'

'যমরাজ তোর সাক্ষী শুনবেন?'

রঘুনাথ বিব্রত হয়ে বললেন, 'যেতে দিন কর্তা, ও-সব ভাবনা পরে ভাবা যাবে। কিন্তু এখন তো সুদিন আসছে বলে মনে হয়। যদি অনুমতি করেন, তা হলে কালই মা-ঠাকরুণকে আনবার জন্যে আমি সারদায়—'

'দাঁড়া, দাঁড়া, আগে থেকেই অমন করতে নেই। রাজা-রাজড়ার মেজাজ, কাব্য শুনিয়ে যদি উল্‌টো ফল হয়? তখন যদি মহারাজ আমার গর্দান নিতে চান? তোর মা-ঠাকরুণকে ডেকে এনে সেইটেই দেখাতে চাস নাকি?'

'আপনার সঙ্গে কথা কয়ে খালি সময় নষ্ট—' বিরক্ত হয়ে চলে গেল রঘুনাথ।

কিন্তু মনের অস্বস্তি কাটছে না ভারতচন্দ্রের। তিনদিন ধরে মহারাজের দর্শন নেই। একে তো এই সব উৎসবের ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত ক্লান্ত, তার ওপরে নানা কারণে তাঁর মন-মেজাজ অত্যন্ত খারাপ। কালীপুজোর পরের দিন নাকি কাশিমবাজার থেকে একজন কুঠিয়াল ইংরেজ এসে মহারাজের সঙ্গে গোপনে কী সব আলোচনা করে গেছে। সেই থেকে মহারাজ তিরিক্ষে হয়ে রয়েছেন।

খবরটা দিয়েছেন গোপাল চক্রবর্তী স্বয়ং। বলেছেন, 'ইংরেজরা নাকি যুবরাজ মীর্জা মামুদকে মোটেই চটাতে চায় না, আর রাজা রাজবল্লভ তাদের আপনার জন। তারা দুদিক রাখতেই চেষ্টা করবে। আর এই দুজনেই মহারাজের চক্ষুঃশূল। তাই—'

সুতরাং কৃষ্ণচন্দ্র অনেক জটিল ব্যাপার নিয়ে ব্যস্ত। অন্তরঙ্গ পার্ষদ হিসেবে মহারাজের কিছু কিছু মনের কথা ভারতচন্দ্রও জানেন, অনেক আলোচনাও দরবারের আশপাশ থেকে শুনেছেন। মুর্শিদাবাদকে ঘিরে ঘিরে যে মেঘ ঘনাচ্ছিল তার ছায়া আরো কালো হয়ে নেমেছে, হয়তো এইবারে ঝড় উঠবে। এর মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্রের সময় কই অন্নদামঙ্গল শোনবার?

এইভাবেই কাটবে। এই চল্লিশ টাকা মাসোহারা, এই শঙ্কর-বলরাম-গোপাল-ভাঁড়ের সঙ্গে রাজার মেজাজ বুঝে মনযোগানো, হিন্দী-বাংলা-ফার্সী-সংস্কৃত মেশানো কবিতা, ধেড়ে-ভেড়েকে নিয়ে মোটা রসিকতা। লীলাকে নিয়ে ঘর আর কোনোদিনই বাঁধা হবে না!

শুধু এইটুকু সান্ত্বনা, তাঁর ভিখারিণী অন্নপূর্ণা মা-র আদেশ তিনি পালন করতে পেরেছেন। মনের সব মমতা ঢেলে ভিখারী শিবের দুঃখ-সুখের ছবি এঁকেছেন। আর অন্তত একজন তাঁর কবিতা শুনে আনন্দ পেয়েছে। সে এমন কেউ নয়—চন্দ্রাবলী। তাঁর মালিনী।

কিন্তু মহাকবি কালিদাস কাকে কাব্য শুনিয়ে সবচেয়ে বেশি সুখী হতেন? মালিনীকে, না মহারাজ বিক্রমাদিত্যকে?

এ-কথার উত্তর কেউ দিয়ে যায়নি। কোনো পণ্ডিত তা জানেন না।

এমনি অনিশ্চয়তার ভেতরে আরো দিন কয়েক কেটে গেল। তারপর একদিন ডাক এল মহারাজার কাছ থেকে।

'কাল থেকে রাজসভায় কাব্যপাঠ শুরু হবে।'

'ব্রহ্মস্বরূপা পরমা জ্যোতীরূপা সনাতনী—'

মনে মনে স্মরণ করে ভারতচন্দ্র চেয়ে দেখলেন সভার দিকে। মাথায় ধবল

ছত্র, দু' পাশে চামর দুলছে, বহুমূল্য সিংহাসনে মখমলের কোমল পাদপীঠে পা রেখে বসেছেন স্বয়ং নবদ্বীপের অধীশ্বর মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়। সিংহাসনের কিছু নীচে দুপাশে রাজার দুইপক্ষের ছয় পুত্রের পাঁচজন সাবালকই আসীন। তা ছাড়া চার জামাতা, দুই ভগ্নীপতি, ভাগিনেয়, ভাগিনীজামাই, পিসে শ্যামসুন্দর। শ্যামসুন্দরের তিন জামাই, জ্ঞাতির দল; এ ছাড়া পণ্ডিত-পরিষদ, দেওয়ান, রাজবৈদ্য, রাজজ্যোতিষী, নর্তক, বাদক, মোগল-ভোজপুরী-বুন্দেল-খণ্ডী সেনানায়কেরাও সভা আলো করে রয়েছেন। আর সকলের মাঝখানে বিকশিতদন্ত গোপাল ভাঁড়, তার পাশে হরষিতকে কানে কানে ক্রমাগত কী যেন বলে চলেছে।

গোপাল ভাঁড়ের দিক থেকে চোখ সরিয়ে নিলেন ভারতচন্দ্র: লোকটাকে যে ঠিক ঘৃণা করেন তা নয়, ওকে যেন নিজের দর্পণের মতো মনে হয়। যেন ওরই ভেতরে নিজের প্রতিচ্ছবি দেখতে পান—এক বিলাসী রাজার সভায় কর্ম-হীন এক বিদূষকের ভূমিকা!

'ব্রহ্মস্বরূপা পরমা জ্যোতীরূপা সনাতনী—'

আবার দেবী ব্রহ্মাণী ইরাকে স্মরণ করলেন ভাবতচন্দ্র। মনে পড়ল, একদিন ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর ফরাসডাঙার বাড়িতে সমস্যা পূরণ করে তাঁকে রাজার কাছে পরীক্ষা দিতে হয়েছিল। আজও তাঁর আর এক পরীক্ষার দিন। আজ দরবারসুদ্ধ লোক তাঁর বিচার করবে, পরীক্ষা হয়ে যাবে সত্যি সত্যিই তাঁর কবিতার কোনো দাম আছে কিনা! এ দেবানন্দপুরে রামচন্দ্র মুন্সীর বাড়িতে সত্যনারায়ণের পুঁথিপড়া নয়, কৃষ্ণচন্দ্রের দরবার সমঝদারের জায়গা, রসিকের আসর।

মহারাজকে একটু শুকনো, একটু বিষণ্ণ মনে হচ্ছিল। তবু মৃদু হেসে বললেন, 'আরম্ভ করো হে ভারত।'

'হাঁ খুড়ো, শুরু করে দাও। পাতা পেড়ে বসে আছি অনেকক্ষণ, গরম লুচি-টুচি দু' একখানা ছাড়ো।'—গোপাল ভাঁড়ের মন্তব্য শোনা গেল। পুঁথিটিকে একবার মাথায় ঠেকিয়ে নিরুত্তরে পাতা খুললেন ভারতচন্দ্র।

মহারাজ বললেন, 'একটু দাঁড়াও। আচ্ছা ভারত, পুঁথি পড়তে তোমার ক'দিন লাগবে?'

'অনুগ্রহ করে রোজ যদি দু দণ্ড ধরে শোনেন, তা হলে দশ দিন।'

'বেশ, তাই হবে।'—তারপর সভার দিকে দৃষ্টি ছড়িয়ে দিয়ে মহারাজ বললেন, 'কিন্তু একটা আদেশ আছে আমার। পুঁথি যতক্ষণ শেষ না হয়, ততক্ষণ কেউ কোনো মন্তব্য করবেন না, কোনো কথা বলবেন না।'

'আজ্ঞে ফিসফিস করেও না?'—গোপাল ভাঁড় জানতে চাইল।

কঠোর গলায় মহারাজ বললেন, 'না। তা হলে তখনই সভা থেকে বের করে দেব।'

তারপর দেশের সেই গুণিজন-প্রতিপালক দানধ্যানে অমিতকীর্তি চার সমাজের অধিনায়ক মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় ভারতচন্দ্র পড়ে চললেন তাঁর কাব্য। বন্দনা শেষ হল, সভা বর্ণনা সাঙ্গ হল, তারপর আরম্ভ হল পার্বতী-পরমেশ্বরের কাহিনী। দক্ষযজ্ঞের সূচনা, দশমহাবিদ্যার রূপ, দক্ষের শিবনিন্দা, সতীর দেহত্যাগ, যজ্ঞবিনাশ, পীঠের বিবরণ; দেবীর নবজন্ম, শিব বিবাহের আয়োজন, মদনভস্ম, রতিবিলাপ, শিববিবাহ, হরগৌরীর সংসার; দরিদ্র সংসারে দাম্পত্য-কলহ, ভিখারী শিব, অন্নপূর্ণার রূপ; ব্যাস ও ব্যাসকাশীর কথা, শেষে দেশে মানসিংহের আবির্ভাব, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্বপুরুষ ভবানন্দ মজুমদারের সৌভাগ্যোদয়ের বৃত্তান্ত—কাহিনীর সমাপ্তি।

এই দশ দিন ধরে নানা অভিব্যক্তি ফুটে উঠল শ্রোতাদের মুখে। ছন্দঃ অলঙ্কারের ছটায় কখনো তাঁরা মুগ্ধ হয়ে বসে রইলেন, কখনো বা বাক্-চাতুর্যে চকিত হলেন, কখনো বা উচ্ছ্বসিত কৌতুকের হাসিতে সভা মুখরিত হল। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরা প্রথমে উপেক্ষার ভাব করে বসেছিলেন, ক্রমে ক্রমে তাঁরাও যেন আকৃষ্ট হয়ে উঠতে লাগলেন। দশ দিন পরে কাব্যপাঠ সমাপ্ত হল। গ্রন্থ বন্ধ করে ভারতচন্দ্র উচ্চারণ করলেন,

"যদক্ষরং পরিভ্রষ্টং মাত্রাহীনঞ্চ যদ্ভবেৎ।
পূর্ণং ভবতু তৎ সর্বং ত্বৎ প্রাসাদাৎ সুরেশ্বরী—"

সকলের আগে উঠে দাঁড়ালেন প্রাচীন গদাধর তর্কালঙ্কার। পৈতাটি তুলে ধরে বললেন, 'অপূর্ব হয়েছে তোমার কাব্য। আশীর্বাদ করছি নরলোকে খ্যাতি তোমার অক্ষয় হোক।'

রাজকবি বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার বললেন, 'ভাষার কবিতায় আমি বিশ্বাস করি না। সংস্কৃতই একমাত্র উচ্চাঙ্গের কাব্যরস বহন করতে পারে। তবু ভারতচন্দ্রের কাব্য শুনে আমি প্রীত হয়েছি। এতে তরলতা আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু বিস্ময়কর কবিত্বের স্ফুরণও রয়েছে। আমি সাধুবাদ জানাচ্ছি।'

বাণেশ্বর এই প্রথম স্বীকৃতি দিলেন ভারতকে। অন্য পণ্ডিতেরা বললেন, 'সাধু, সাধু!' কালিদাস সিদ্ধান্ত অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি মুগ্ধ স্বরে বললেন, 'রসে অলঙ্কারে অনুপম। সমস্ত শাস্ত্র-পুরাণ মন্থন করা বিদ্যা। ভাষায় এমন কাব্য আর লেখা হয়নি। মহারাজের শতরত্ন সভায় কবি ভারত-চন্দ্র শ্রেষ্ঠ রত্ন।'

গোপাল ভাঁড় বললে, 'বুড়ো ব্যাসটাকে খুব জব্দ করে দিয়েছ খুড়ো। "গর্দভ হইবে বুড়ী এখানে যে মরে।" হা-হা-হা। কিন্তু খামোকা তুমি আবার হরিহর অভেদ-টভেদ করতে গেলে কেন? ও জায়গাটা কেটে দাও। ও-সব

ন্যাড়ানেড়ীগুলোর কথা শুনলেও গা জ্বালা করে। বরং শিবকে আর একবার ক্ষেপিয়ে দিয়ে বোষ্টম-টোষ্টমগুলোকে নিকেশ করে ফেলো।'

আফিঙের নেশায় টকটকে রাঙা চোখ মেলে রাজার পিসেমশাই শ্যামসুন্দর চাটুজ্জে বললে, 'তুমি থামো গোপাল। কীলোৎপাটীব বানরের মতো তুমি আর অব্যাপারে নাক গলিয়ো না।'

বিষ্ণুভক্ত মুক্তিরাম মুখুজ্জে বললেন, 'অপূর্ব—অপূর্ব! ভারত, তোমার মনে কোনো সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি নেই, তুমি শ্যাম ও শ্যামার অভেদত্ব উপলব্ধি করেছ, এ দেখে বড়ো আনন্দ হল।'

শুধু মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র গম্ভীর বিষণ্ণ হয়ে বসে রইলেন। সভাসদদের আলোচনা, মন্তব্য, কিছুই তিনি শুনতে পাচ্ছিলেন না। কপালে কয়েকটা কুঞ্চিত রেখা, চোখ অর্ধনিমীলিত।

একটু পরে ডাকলেন, 'ভারত!'

'আদেশ করুন, মহারাজ।'

'তোমার রচনা অতি উত্তম। কিন্তু—কিন্তু এ আমি চাইনি।'

এক মুহূর্তে সভা স্তব্ধ হয়ে গেল। পরম কাব্যরসিক, মহাপণ্ডিত রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কাছ থেকে এ প্রত্যাশা কেউ করেনি। এমন কি গোপাল ভাঁড় পর্যন্ত আশ্চর্য হয়ে চেয়ে রইল, বিবর্ণ হয়ে গেল ভারতচন্দ্রের মুখ।

রাতের পর রাত, দিনের পর দিন। আহার-নিদ্রা ছিল না, বিশ্রাম ছিল না। সমস্ত মনপ্রাণ, জীবনের সব সাধনা ভারতচন্দ্র তাঁর কাব্যের প্রতিটি ছত্রে ঢেলে দিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত এই তার পারিশ্রমিক!

রাজা বললেন, 'তোমার কাব্য অসম্পূর্ণ। এ রাজসভার যোগ্য নয়।'

'মহারাজ—'

'আজ সন্ধ্যাবেলায় তুমি আমার সঙ্গে দেখা করবে—' রাজা সিংহাসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন : 'তখন আমার যা বক্তব্য সে আমি তোমাকে বলব। সভাভঙ্গ হল আজকে।'

অন্তঃপুরের দিকে চলে গেলেন মহারাজা। দরবারের আর এক দরজা দিয়ে মাথা নিচু করে বেরিয়ে গেলেন ভারতচন্দ্র, তখন আর মাটি নেই তাঁর পায়ের তলায়।

সারাদিন আর ঘরে ফিরলেন না। উদ্‌ভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়ালেন শহরের পথে পথে—বার বার নিজেকে প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হল : কী হল—কী হল? শেষ পর্যন্ত এরই জন্যে একটা বছর তিনি কৃষ্ণনগরে চাটুকারী করে কাটালেন? 'তদর্ধং রাজসেবায়াং ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ—' কিন্তু রাজসেবার চাইতে ভিক্ষাও ভালো। সেখানে আত্মমর্যাদার কোনো বালাই থাকে না বলে আত্মসম্মান হারাবার কোনো ভয়ও থাকে না। এ-ই রাজা? এ-ই রসিকশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণচন্দ্র? এরই স্তুতি গানে তিনি পাতার পর পাতা ভরিয়েছেন?

ভারতচন্দ্র খড়ে নদীর ধারে এসে দাঁড়ালেন। ওপারে সবুজ মাঠ, কৃষকের খড়ের চালা, আম-জাম-বাঁশবনের ছায়া ঘন হয়ে আছে। ওখানকার মানুষগুলো কাব্য বোঝে না, ব্যাকরণ বোঝে না, অলঙ্কার বোঝে না। এক মুঠো হাসিকান্না নিয়ে এতটুকু জীবন—কোনো মতে বেঁচে থাকবার চেষ্টা। রাজা-মগ-বর্গী-ফিরিঙ্গি—ওদের কাছে সব সমান। ওরা সকলের শিকার। ডাকাত লুট করে নিয়ে যায়, বর্গীতে গ্রামের পর গ্রামে আগুন জ্বালিয়ে দেয়, রাজার কাছারীতে ধরে এনে ওদের জাঁতা-পেষাই দিয়ে রস নিংড়ে বের করে নেওয়া হয়। ভারতচন্দ্রের আজ মনে হল, ওদের চোখের জলের অভিশাপেই রাজা নরেন্দ্রনারায়ণের রাজত্ব গেছে, সেই অভিশাপই তাঁকে ঠেলে দিয়েছে বর্ধমানের রাজকারাগারে, দেশ-দেশান্তরে তাঁকে ছুটিয়ে বেড়িয়েছে। তবু তাঁর মোহ কাটেনি, তবু রাজসভাতেই আবার তিনি ভাগ্যের সন্ধান করেছিলেন।

ভালোই হয়েছে। ভিখারী শিব আর ভিখারিণী অন্নপূর্ণা তাঁকে বুঝিয়ে দিয়েছেন, ও তাঁর জায়গা নয়!

একটা গাছের ছায়ায় বসে অনেকক্ষণ নদীর দিকে চেয়ে রইলেন ভারতচন্দ্র। বর্ষার ভরাস্রোতের জল কার্তিকে এখন শীর্ণ হয়ে গেছে, তবু খড়ে ছুটেছে খর ধারায়। ওই স্রোতের দিকে তাকিয়ে সেই আঠারো বছরের দিনগুলোর স্বপ্ন দেখতে লাগলেন তিনি। বেশ ছিল সেই জীবন। এমন করে আবার সেই রাজসভার পাপচক্রে এসে পড়বেন—কে ভাবতে পেরেছিল সে-কথা।

চলে যাবেন এখান থেকে? কোনো শান্ত পাড়াগাঁয়ের ছায়ায় গিয়ে খুলবেন টোলচতুষ্পাঠী? কিন্তু আজকাল কেউ আর সংস্কৃত পড়ে না, এখন কালিদাস-মাঘ-ভবভূতি-ভারবিতে লোকের অনুরাগ নেই। যাজন-যজন করবেন? তাতে আপত্তি নেই। ব্রাহ্মণ-সন্তানের ওতে লজ্জা পাওয়ার কথা নয়।

বিকেলের আলো শেষ হয়ে নদীর জলে সন্ধ্যা নামল : কালো হয়ে উঠল খড়ের স্রোত, তারার ছায়া জলের টানে ছুরির ফলার মতো দীর্ঘায়িত হল। শঙ্খঘণ্টার আওয়াজ উঠল। তখন ওপারের মাঠ-ঘাট অন্ধকার আর অনিশ্চিত হয়ে এল—পেছনে শহরের আলোগুলোই তখন তাঁকে ডাকতে লাগল। মনে পড়ে গেল, রাজা তাঁকে সন্ধ্যার সময় দেখা করতে বলেছিলেন।

একটা নিঃশ্বাস ফেলে ভারতচন্দ্র ফিরে যাওয়ার জন্যে পা বাড়ালেন।

সন্ধ্যাপুজো শেষ করে রাজা খাসকামরায় অপেক্ষা করছিলেন তাঁরই জন্যে। যেতেই ডাক পড়ল।

ফিরিঙ্গি কেতার আরামকেদারায় শুয়ে রাজা গড়গড়া টানছিলেন। ঘরে তিনি একা। বললেন, 'বোসো।'

রাজাকে প্রণাম করে নিঃশব্দে আসন নিলেন ভারতচন্দ্র।

কৃষ্ণচন্দ্র মুখ থেকে গড়গড়ার নল নামিয়ে রাখলেন। হাসলেন সস্নেহে। 'খুব অভিমান হয়েছে, না ভারত?'

'না মহারাজ, অভিমান আবার কিসের? আপনাকে সন্তুষ্ট করতে পারিনি—এ আমারই দুর্ভাগ্য।'

'কাব্য তোমার উৎকৃষ্ট হয়েছে ভারত, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এ-ও তো মুকুন্দরামের মতোই হল। সেই দেবতার বন্দনা, সেই দেবতার কাহিনী, সেই নাম-মহিমা, তীর্থ-মাহাত্ম্য, তার ফাঁকে ফাঁকে মানুষের সাদা-মাটা সুখ-দুঃখের কথা। তোমার কাব্যে রস কোথায় ভারত?'

'রস নেই মহারাজ?'—ভারতচন্দ্র চমকে উঠলেন।

'না, রস নেই। রসের শ্রেষ্ঠ আদিরস, তাই যদি না থাকে, তা হলে চণ্ডীর গীত লেখা হতে পারে, কিন্তু কাব্য হয় না। স্বয়ং কালিদাসের কুমার-সম্ভব দ্যাখো। দেবতাকে আশ্রয় করেও—'

ভারতচন্দ্র মাথা নামালেন : 'কিন্তু মহারাজ, কুমার-সম্ভবের ও অংশটা কি খুব শোভন হয়েছে?'

'কাব্য কাব্যই, তা কামন্দকীয় নীতিসার নয়। রস যেখানে আসল কথা, শোভন-অশোভনের প্রশ্ন সেখানে অবান্তর। তুমি বিহ্লণ পড়েছ, ভারত?'

'পড়েছি মহারাজ।'

'অমরু শতক?'

'পড়েছি।'

'রাজশেখর?'

'দেখেছি মহারাজ।'

'তুমি তো ভালো ফার্সী জানো। কিস্‌সা পড়েছ কিছু কিছু?'

'পড়বার সৌভাগ্য হয়েছে।'

'তবে তো তুমি সবই জানো।'—মহারাজ একটু থামলেন : 'দিনকাল দেখতে পাচ্ছ না? লোকের রুচি বদলে যাচ্ছে, মন বদলে যাচ্ছে। দেবতার কথা শুনতে কারো আর ভালো লাগে না। রামায়ণ গান, কথকতায় লোকের আর মন নেই, এখন খেউড় গান শুনতে তারা ভিড় করে। একালে অন্নদার কথা কে শুনবে ভারত?'

'কিন্তু মহারাজ, ইতরের রুচি পরিচর্যা করাই কি কবির কাজ?'

'কবিরও তো শ্রোতা চাই, ভারত।'—কৃষ্ণচন্দ্র হাসলেন : 'রাজসভায় যারা বাহবা দিয়েছে, তাদেরও মন পড়ে আছে নদে, শান্তিপুরের খেউড়ের দিকে। তা ছাড়া আসল কথা, আমি তোমাকে কবি হিসেবেই দেখতে চাই, পাঁচালী-লিখিয়ে বলে নয়। আর—'

মহারাজ একটু থামলেন। ভারতচন্দ্র বললেন, 'আর?'

'নানা ঝঞ্ঝাটে আমারও মন-টন একেবারেই ভালো নেই। চারদিক থেকে কেমন মেঘ ঘনিয়ে আসছে। কী যে হবে কিছুই বুঝতে পারছি না। এগুলো ভুলতে চাই, ভারত। মজিয়ে দাও, নেশা ধরিয়ে দাও।'

একটু চুপ করে থেকে ভারতচন্দ্র বললেন, 'কিন্তু আমার তো কালিদাসের মতো সাহস নেই মহারাজ। তিনি কুমার-সম্ভবে যা করেছেন তা আমার সামর্থ্যে কুলোবে না।'

'তার দরকার নেই। নতুন অংশ জুড়ে দাও তোমার কাব্যে।'

'নতুন অংশ?'

'হাঁ—আদি রস। সব রসের সেরা, কাব্যের প্রাণ। আর, তুমি তো জানো, আমি বীরাচারী—শাক্ত। তন্ত্রের সাধনায় যার দীক্ষা হয়েছে, ভৈরব-ভৈরবীর নিগূঢ় রহস্য যার জানা, তার এ-সব নিরিমিষে মন উঠবে কেন? অতএব—' অল্প একটু হেসে মহারাজ আবৃত্তি করলেন, 'চৌর পঞ্চাশৎ':

"অদ্যাপি তাং মকরকেতুশরাতুরাঙ্গী—
মুত্তুঙ্গপীবরপয়োধরভার খিন্নাম্।
সংপীড্য বাহুযুগলেন পিবামি বক্তুং
প্রোন্মত্তবন্মমধুকরঃ কমলং যথেষ্টং—"

মহারাজ একটু থামলেন। বললেন, 'হালিশহরের রামপ্রসাদ সেনের নাম শুনেছ?'

'শুনেছি। পরম ভক্ত সাধক তিনি। মহারাজ তাঁকে বিশেষ অনুগ্রহ করেন, তা-ও শুনেছি।'

'হুঁ, লোকটা অদ্ভুত। ভক্তি আর প্রতিভার আশ্চর্য সমন্বয় হয়েছে তার মধ্যে। কিন্তু রামপ্রসাদ আধা-পাগল, শ্যামা-সংগীত গেয়েই তার দিন কাটে। সে একখানা "বিদ্যাসুন্দর" লিখেছিল বটে, কিন্তু জমেনি। ও-সব লোককে দিয়ে হয় না।—' মহারাজ এবার ভারতচন্দ্রের দিকে তাকালেন: 'তুমি পারো নতুন একখানা বিদ্যাসুন্দর লিখতে?'

'আমি?'

'তুমিই যোগ্য লোক হে। তা ছাড়া মহাকালীর মংগল-কাব্যে বিদ্যা-সুন্দরের কাহিনীই তো খাপ খাবে সব চাইতে বেশি। যাও, লিখে ফেলো।'

নতশিরে ভারতচন্দ্র বসে রইলেন কিছুক্ষণ। দেউড়ী থেকে নহবতের আওয়াজ আসতে লাগল, আসতে লাগল ঘড়ি বাজবার শব্দ। একটা নিঃশ্বাস ফেললেন, তারপর উঠে দাঁড়ালেন ধীরে ধীরে। বললেন, 'আদেশ শিরোধার্য, মহারাজ। আমি চেষ্টা করব।'

॥ এগারো ॥

ঘরের ভেতরে, বারান্দায় অস্থিরের মতো পায়চারী করছিলেন ভারতচন্দ্র। আদি রস। আদিরসের বন্যা বইয়ে দিতে হবে, রাজার মন ভালো করে দিতে হবে, দেশের লোকের ইতর-রুচির উপাসনা করতে হবে! যে শ্রদ্ধা-ভক্তি নিয়ে অন্নপূর্ণার মহিমা বন্দনা রচনা করতে চেয়েছিলেন, সেই মনকে আজ চালনা করতে হবে গণিকাবৃত্তির দিকে।

রাজা তন্ত্রের উপাসক। তিনি হয়তো আদিরসকে সাধন-রহস্যে পেঁাছে দেবেন, বলবেন, 'এ তো বীর-সাধকের সিদ্ধিলাভের পথ।' কিন্তু সাধারণ মানুষ? তাদের ক'জন কাব্যের আড়ালে তত্ত্বের সন্ধান করে? তন্ত্রের আসল রহস্য বুঝতে সাধকেরও বিভ্রম ঘটে, আর কাব্যের আধারে তা—

শুধু বিকার ফেনিয়ে উঠবে, শুধু উদ্ভ্রান্তি দেখা দেবে। আর লোকে বলবে, ভারতচন্দ্র রায় বাংলা ভাষায় ভারী রংদার কেচ্ছা লিখেছে একখানা, তা ফার্সী কেচ্ছাকেও লজ্জা দেয়।

অসম্ভব! পারবেন না ভারতচন্দ্র।

তার চাইতে চলেই যাবেন এখান থেকে। লীলাকে নিয়ে কোনো দূর গ্রামে বাসা বাঁধবেন, যজন-যাজন করেই একভাবে দিন কেটে যাবে। রাজার ছেলে হয়েও দারিদ্র্যকে তিনি জেনেছেন, পথে পথে ঘুরেছেন, গাছের তলায় হাটে-মাঠে কত রাত কত দিন তাঁর কেটেছে। বলতে গেলে ঐশ্বর্যের কথা আজ ভুলেই গেছেন তিনি। লীলাও গরীবের মেয়ে, নিরন্ন ব্রাহ্মণের সংসারে তার কোনো কষ্ট হবে না।

'ঠাকুরমশাই।'

চেয়ে দেখলেন, চন্দ্রাবলী। এমন অসময়ে সে কখনো আসে না।

'তুমি এখন কোথা থেকে এলে?'

'গান শিখতে গিয়েছিলুম ওস্তাদজীর কাছে। কিন্তু কী হল ঠাকুর? কাব্য পছন্দ হল না মহারাজের?'

ভারতচন্দ্র আশ্চর্য হলেন।

'তুমি কেমন করে জানলে?'

'আমরা সব জানতে পারি।'—চন্দ্রাবলী একটু হাসল : 'রাজসভার একজন যে অনুগ্রহ করে আমার কুঞ্জে আসেন যান।'

মুহূর্তে ভারতচন্দ্রের মন ঘৃণায় সংকুচিত হয়ে গেল। যেমন রাজসভা

তেমনি তার নর্তকী। এখানে সব সমান। এই মেয়েটিকেই এক সময় তাঁর নিজের প্রেরণা বলে বোধ হয়েছিল! ছি—ছি!

চন্দ্রাবলী বললে, 'খুব ঘেন্না হল, না ঠাকুর?'

ভারতচন্দ্র দাঁতে দাঁত চাপলেন : 'না, ঘৃণা করব কেন? যার যা উপজীবিকা।'

'উপজীবিকা নয়, পাপ। আমরা তো নরকের কীট, পাপেই ডুবে আছি। তবুও সান্ত্বনা আছে। সর্বং কৃষ্ণময়ং জগৎ। যিনি আমার কাছে আসেন, তিনিই আমার কৃষ্ণ। তাঁর ভেতর দিয়ে আমার ঠাকুরের আরাধনা করি।'

'তাই করো। কিন্তু আমি চলে যাচ্ছি এখান থেকে।'

'চলে যাবে? কেন?'

'আমার কাব্যে রাজার মনস্তুষ্টি হয়নি। তিনি আদিরস চান। কবিতায় আমাকে খেউড় গাইতে হবে। সে আমি পারব না।'

চন্দ্রাবলী একটু চুপ করে রইল। তারপর বললে, 'একটা কথা শুনবে আমার?'

ভারতচন্দ্রের সমস্ত মুখ তিক্ত বিস্বাদ হাসিতে ভরে উঠল : 'তোমাদের কথাই তো শুনতে হবে; তোমরাই তো আজ রস-রুচি-কাব্যের ভাগ্যবিধাতা। কালিদাসের পরিণাম ঘটেছিল লক্ষহীরার কুঞ্জে—আমাকেও একদিন তোমার কুঞ্জেই যেতে হবে সব দেনা মিটিয়ে দেবার জন্যে। নইলে আমি রাজকবি হতে পারব না।'

চন্দ্রাবলী জিভ কাটল : 'এমন কথা বলতে নেই, ঠাকুর। এত পুণ্য আমি করিনি যে আমার ঘরে তোমার পায়ের ধুলো পড়বে। এ তোমার অভিমান। কিন্তু আদিরসে তোমার এত বিরাগ কেন?'

'আমি দেবতার পুজোয় মন্ত্রই পড়তে চাই চন্দ্রাবলী, শৃঙ্গার শতক আওড়াতে চাই না।'

'কিন্তু নব রসেই তো দেবতার অর্ঘ্য সাজানো যায়।'

বিকৃত মুখে ভারতচন্দ্র বললেন, 'কামকলা দিয়েও?'

'কেন নয়? আদি রসের উপকরণেই তো রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা। সে লীলার কাহিনী শুনে তো কেউ লালসায় আতুর হয় না, ভক্তির অশ্রু নামে তার চোখ দিয়ে। ঠাকুর, লেখাপড়া আমি জানি না—কিন্তু নবদ্বীপের মেয়ে, অনেক মহাজনকে দেখেছি, অনেকের কথা শুনেছি। স্বয়ং মহাপ্রভুও তো গীত-গোবিন্দ পড়ে ভাবে বিভোর হয়ে যেতেন। সে কি আদিরসের জন্যে?'

ভারতচন্দ্র চমকে উঠলেন।

'চন্দ্রাবলী, তাই বলে অন্নদা কাব্যে—'

'ঠাকুর, তোমার কাছে হরি-হর এক। শ্যাম-শ্যামা অভেদ। যদি শ্যামার গান শুনিয়ে থাকো, তাহলে, শ্যামের গানও শোনাও তার সঙ্গে।'

'কিন্তু মহারাজ শাক্ত। তিনি তা শুনবেন না।'

'শোনাতে জানলেই শুনবেন।'—চন্দ্রাবলী হাসল : 'তুমি তো পরম পণ্ডিত, তোমাকে আমি আর নতুন কথা কী বলব? তুমি নরলীলাকে আশ্রয় করেই রাধাকৃষ্ণের কথা শোনাও।'

'লোকে তো বুঝবে না। তারা লৌকিক অর্থই করবে।'

'সে তো মহাজন পদাবলীরও করে। যে বোঝবার ঠিক বুঝবে।'

ভারতচন্দ্র হতাশভাবে মাথা নাড়লেন একবার।

'কেউ বুঝবে না চন্দ্রাবলী, বোঝবার লোক কোথাও নেই। সব বিকৃত হয়ে গেছে, সব পচে গেছে। মহারাজের মতোই সারা দেশ এখন শবসাধনায় বসেছে। পচা মড়ার গন্ধ, কারণ আর ভৈরবী, আর কিছুই তারা বুঝবে না।'

'সময় হলে ঠিকই বুঝবে। তুমি লেখো ঠাকুর, আদিরসকে আশ্রয় করে নরলীলার কথাই শোনাও। বাইরে থাকুক বিলাস, ভেতরে থাকুক বৈরাগ্য। তোমার সাধনায় ফাঁকি ঘটবে না।'

ভারতচন্দ্র চন্দ্রাবলীর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন এক দৃষ্টিতে। চন্দ্রাবলী লজ্জা পেল।

'কী দেখছ ঠাকুর?'

'তোমাকে।'

'কী আছে আমার মধ্যে দেখবার?'

'ভাবছি, এই কৃষ্ণনগরে তোমাকে কেউ চিনতে পারল না। একটা ছদ্মবেশের আড়ালেই তুমি লুকিয়ে রইলে।'

চন্দ্রাবলী চুপ করে রইল, কথাটার জবাব দিল না। তারপর বললে, 'আমি এখন যাই। তুমি লেখো।'

'লিখব?'

'হাঁ, লেখো। মনে থাকুক রাধাগোবিন্দ, বাইরে থাক লোকলীলা। প্রণাম।'

আবার দু সপ্তাহ পরে হুজুরে সেলাম দিলেন ভারতচন্দ্র।

'মহারাজ, আমার কাব্য প্রস্তুত।'

'আদিরস?'

'হাঁ মহারাজ, বিশুদ্ধ প্রেমকথা।'

'সংস্কৃত নাটকের সেই "হা প্রিয়ে—চন্দ্রাননে! এই মলয় বাতাসে বিরহ জ্বরে আমি জর্জরিত"—এই সব পোশাকী প্রেমের কথা নয় তো?'

'না মহারাজ, এ রসে কোনো আবরণ নেই।'

'সাধু—সাধু!'

একবারের জন্যে অপরিসীম একটা গ্লানির উচ্ছ্বাস মনের ভেতরে ফেনিয়ে উঠল। কিন্তু ভারতচন্দ্র আত্মসংযম করলেন।

মহারাজ বললেন, 'শুভস্য শীঘ্রং। তা হলে কালই হোক।'

'কিন্তু মহারাজ, একটি নিবেদন আছে। কালকের আসরে কুমারেরা, মহারাজের পূজণীয় আত্মীয়েরা, তর্কসিদ্ধান্ত, বাচস্পতি, ন্যায়ালঙ্কার, বিদ্যাবাগীশ, ন্যায়পঞ্চানন, বিদ্যালঙ্কার আর প্রবীণেরা কেউই থাকতে পারবেন না।'

কৃষ্ণচন্দ্র হেসে উঠলেন : 'বুঝেছি, আর বলতে হবে না।'

অন্তরঙ্গ আসর বসল পরদিন সন্ধ্যায়। একবার চোখ বুজে কৃষ্ণনাম স্মরণ করলেন ভারতচন্দ্র। শুরু হল 'অন্নদামঙ্গলে' নতুন সংযোজন 'বিদ্যা-সুন্দরের' কাহিনী :

"শুন রাজা সাবধানে পূর্বে ছিল এইখানে
বীরসিংহ নামে নরপতি।
বিদ্যা নামে তার কন্যা আছিল পরমধন্যা
রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী।
প্রতিজ্ঞা করিল সেই বিচারে জিনিবে যেই
পতি হবে সেই সে তাহার।
রাজপুত্রগণ তায় আসিয়া হারিয়া যায়
ভাবে রাজা কি হবে ইহার—"

তারপর বর্ধমান প্রবেশ, নারীগণের খেদ এবং সুন্দরের মালিনীদর্শন হতেই আসর জমাট হয়ে উঠল। তিনদিন ধরে শ্রোতাদের কারো আর নিঃশ্বাস পড়ল না। শুধু থাকতে না পেরে মাঝখানে একবার গোপাল ভাঁড় চেঁচিয়ে উঠেছিল, 'কাত করে বই ধোরো না খুড়ো, কাত করে বই ধোরো না। রস গড়িয়ে পড়ে যাবে!'

পাঠ শেষ করে ভারতচন্দ্র যখন বসলেন, তখন স্বয়ং আসন ছেড়ে উঠে এলেন মহারাজ। দু' হাত দিয়ে তুলে ধরলেন ভারতচন্দ্রকে।

'অপূর্ব—অদ্ভুত। কৌতুকে, রসিকতায়, কবিত্বে কামশাস্ত্রকে মহাকাব্য করে তুলেছ তুমি। বিহ্লণ, অমরু, রাজশেখর—সবাই ম্লান হয়ে গেছে তোমার কাছে। আজ আমি তোমায় উপাধি দিচ্ছি "রায়গুণাকর"।'

ভারতচন্দ্র জবাব দিলেন না। নীরবে ঘর্মাক্ত কপাল মুছে ফেললেন। সভাসদেরা বললেন, 'মহারাজের জয় হোক।'

রাজা মৃদু হেসে বললেন, 'তবু নিন্দুকের স্বভাবই এই যে, সে খুঁৎ না ধরে থাকতে পারে না। এই অনন্য কাব্য-সম্পর্কেও কবির কাছে আমার ছোট একটি অনুরোধ আছে।'

সভাস্থ সকলে আশ্চর্য হলেন, উৎকণ্ঠায় ভরে উঠল ভারতচন্দ্রের মন। শুকনো গলায় বললেন, 'হুকুম করুন মহারাজ।'

গোপাল ভাঁড় বললে, 'মালিনী মাসীকে দিয়ে যদি আর একটু রগড় বাড়ানো যেত—' ধমক দিয়ে রাজা বললেন, 'চুপ—একটা বাজে কথাও তুমি বোলো না।

রায়গুণাকর, মশানে সুন্দরের কালীস্তুতির আগে যে অংশটা তুমি লিখেছ, ওই অংশটুকু তোমাকে বাদ দিতে হবে। ওই যে লিখেছ—"চন্দ্র-সূর্য যতদিন রবে" —ততদিন প্রেম অমর, প্রিয়ার জন্যে বারে বারে আমি প্রাণ দেব—এগুলো বড্ড বেশি গম্ভীর হয়ে গেছে। একেবারেই যেন খাপ খায়নি।'

ভারতচন্দ্র চমকে উঠলেন। প্রেমের জন্যে এই মৃত্যু—এই বেদনা, এই কথা—কার কাছে শুনেছিলেন তিনি? সেই চন্দননগর, লালদীঘির ধার—জাঁ নামে সেই অদ্ভুত মানুষটা—

মশানে সুন্দরের কথা ভাবতে গিয়ে তাঁর কি সেই ফিরিঙ্গি মার্সেলের কথাই মনে পড়ে গিয়েছিল?

রাজা বললেন, 'কবি, এই অনুরোধ আমার রাখতে হবে।'

ভারতচন্দ্র বিষণ্ণ হাসি হেসে বললেন, 'তাই হবে মহারাজ, ও জায়গাটা আমি বাদই দেব।'

'তা হলেই কাব্য সর্বাঙ্গসুন্দর হবে।'—একটু থেমে, কী ভেবে রাজা আবার বললেন, 'আমি জানি, তুমি গৃহহীন, নিঃস্ব। তোমার স্ত্রী পিত্রালয়ে পড়ে আছেন, তাঁকে নিজের কাছে নিয়ে আসবার সামর্থ্য তোমার নেই। আমি তোমাকে কিছু ভূ-সম্পত্তি এবং একটি ভদ্রাসন দিয়ে পুরস্কৃত করতে চাই। বলো, কোথায় বাস করতে তোমার বাসনা।'

পারিষদেরা আবার বললে, 'মহারাজ দাতাকর্ণ। তাঁর জয় হোক।'

ভারতচন্দ্র মাথা তুললেন। এতদিনের রাজসেবা সার্থক। কিন্তু কোন্ মূল্যে—কিসের পণ্যে? বিদ্যাসুন্দর কাহিনীর অন্তরালে কে খুঁজবে রাধাশ্যামের রসতত্ত্ব? কে বুঝবে ও লৌকিক কাহিনী নয়? বিদ্যার সঙ্গে সুন্দরের মিলনে চিরকাল রসলোক গড়ে ওঠে—তার গোপন রহস্য যে এর মধ্যে লুকিয়ে রইল, একজন ছাড়া কে জানবে সে-কথা?

মহারাজ আবার বললেন, 'বলো ভারত, কোথায় বাস করতে চাও তুমি।'

মনে পড়ল ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীকে। সেই এক আশ্চর্য মানুষ। মনে পড়ল বিদ্যাধরীকে, যাকে দেখে তিনি চন্দ্রাবলীকে দেখতে পেয়েছিলেন, আর চন্দ্রাবলীকে না দেখলে হয়তো বিদ্যাসুন্দর লেখাই হতো না। সবই চৌধুরী-মশাইয়ের জন্য। তাঁর ঋণ জীবনে কোনোদিন ভোলবার নয়।

'মহারাজ, আমার সব সৌভাগ্যের মূলে চৌধুরীমশাই। তিনিই আপনার মতো কল্পতরুর ছায়ায় আমার আশ্রয় জুটিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর কাছাকাছি, গঙ্গাতীরে কোথাও যদি আমি বাস করতে পারি—'

এক মুহূর্ত চিন্তা করলেন মহারাজ। ডাকলেন গোপাল চক্রবর্তীকে।

'চক্রবর্তী, ফরাসডাঙার কাছে গঙ্গার ধারে কোন্ গ্রাম ভারতকে দেওয়া যেতে পারে?'

চক্রবর্তী বললেন, 'মহারাজ, মূলাযোড়।'

'খুব ভালো। কালই সব লেখাপড়া করে দেবে। বাড়ি তৈরী করার জন্যেও লোক পাঠিয়ে দাও। আর বাড়ি যতদিন তৈরী না হয়'—মহারাজ ভারতচন্দ্রের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন: 'ততদিন তোমার কাছে আমার আর একটি ফরমাস আছে ভারত।'

'বলুন, মহারাজ।'

'নায়ক-নায়িকার লক্ষণ নির্দেশ করে আর একটি কাব্য তুমি লিখে দেবে আমার জন্যে।'

'তাই হবে, মহারাজ।'

আজও অনেক রাত পর্যন্ত পথে পথে ঘুরলেন ভারতচন্দ্র, তারপর এসে দাঁড়ালেন খড়ে নদীর ধারে। ওপারে নিবিড়-পুঞ্জিত অন্ধকার—গ্রামের একটি আলোও চোখে পড়ে না। কী তিথি আজ? মনে পড়ল, অমাবস্যা।

নদীর জলের ওপর একটা মৃদু কুয়াশার আবরণ ছড়িয়ে পড়েছে। শীতের হাওয়া। সেদিনও যে কাশফুলগুলো দেখে গিয়েছিলেন, মনে হল আজ তারা ঝরতে শুরু করে দিয়েছে। এদিকে শহরের আলো, ওপারে হেমন্তের শীতল অমাবস্যা।

সেই অমাবস্যায় গ্রাম ডুবে আছে, দেশ ডুবে আছে। আরো কোন্ অন্ধকার তার জন্যে অপেক্ষা করে আছে কেউ জানে না। সেই আগামী শীতের রাতের জন্যে ভারতচন্দ্র লিখে গেলেন তাঁর বিদ্যা-সুন্দর। কবিকঙ্কণের গান হারিয়ে যাবে, অন্নপূর্ণার কথা কেউ শুনতে চাইবে না—কিন্তু বিদ্যা-সুন্দরের গানে সে রাত বিষে আবিল হয়ে উঠবে। সেই বিষপাত্র ভারতচন্দ্রই আজ দেশের মুখে তুলে দিয়ে গেলেন।

কে বুঝবে সেই কাহিনীর আসল রহস্য? ভারতচন্দ্রের মনের কথা কে জানবে—শুধু একজন ছাড়া?

আজ তিনি বিজয়ী। কিন্তু কোন্ মূল্যে? প্রতিভার কোন্ পণ্যে?

খড়ে নদীর তামস-তরঙ্গ চোখের সামনে দিয়ে একটা মৃত্যুস্রোতের মতোই বয়ে যেতে লাগল।

বাড়ি ফিরে দেখলেন, রঘুনাথ আনন্দে অধীর।

'এমন দিনে এতক্ষণ কোথায় ছিলেন কর্তা? আমি যে কালীবাড়িতে পাঁচসিকের পুজো দিয়ে এলুম।'

'এত আনন্দ কেন?'

'বাঃ, আনন্দ করব না? খেতাব পেলেন, জমি-জায়গীর পেলেন, রাজকবি হলেন—আর কী চাই?'

'এর মধ্যেই কানে গেছে তাহলে?'

'আজ্ঞে শুধু আমার কানে কেন, গোটা কেষ্টনগরেই ছড়িয়ে গেছে। সেই

যে মেয়েটি—যে আপনাকে পুজোর ফুল দিয়ে যায়, সেই তো খবরটা দিয়ে গেল আমাকে।'

'চন্দ্রাবলী?'—ভারতচন্দ্র চকিত হয়ে উঠলেন।

'আজ্ঞে হাঁ, সেই চন্দ্রাবলী না বিন্দে দূতী, সেই-ই। সে আরো বলে গেল, আপনার সঙ্গে বোধহয় আর দেখা হবে না।'

'দেখা হবে না?'—যন্ত্রণায় ভারতচন্দ্রের হৃৎপিণ্ডে যেন মোচড় লাগল: 'কেন, কী হয়েছে?'

'মহারাজ তাকে কলকাতার কোন্ মহাজনের বাড়িতে নাচতে পাঠাচ্ছেন। এর পর সেখানেই থাকতে হবে তাকে। আজ রাতেই যেতে হবে রওনা হয়ে। আপনার সঙ্গে তো আর দেখা হবে না, তাই যাওয়ার আগে হাজার হাজার প্রণাম জানিয়ে গেছে আপনার পায়ে।'

ভারতচন্দ্র দাওয়ার ওপর বসে পড়লেন। চন্দ্রাবলী তাঁর কেউ নয়। সে গণিকা, রাজার নর্তকী। তবু—তবু সে না থাকলে ভারতচন্দ্র লিখতে পারতেন কি বিদ্যাসুন্দর? শ্যামার কাহিনীতে মেলাতে পারতেন শ্যামসুন্দরকে?

হৃৎপিণ্ড থেকে যন্ত্রণাটা যেন মস্তিষ্কের মধ্যে উঠে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। কৃষ্ণনগরে আর থাকা যায় না—আর একদিনও নয়।

'কর্তা এবার অনুমতি করুন।'

কোনো জবাব এল না।

'কই, কথা বলছেন না কেন? অনুমতি করুন।'

'কিসের অনুমতি?'—যেন ঘুম থেকে জেগে উঠলেন ভারতচন্দ্র।

'বা-রে, আনতে হবে না মা-ঠাকরুণকে? যেতে হবে না সারদায়?'

'ওঃ।'

'তা হলে কালই রওনা হয়ে পড়ি?'

ভারতচন্দ্র আবার নিজের মধ্যে তলিয়ে যেতে যেতে বললেন, 'আচ্ছা।'

পাঁচ বৎসর পরে কীর্তিমান কবি ভারতচন্দ্র কৃষ্ণনগর দরবার থেকে মুলাযোড়ে ফিরে এলেন। মুলাযোড়েই তাঁর স্থায়ী বাস, তবু মাঝে মাঝে রাজার চরণে গিয়ে প্রণাম নিবেদন করে আসতে হয়। এবার একটু অন্য ঝঞ্ঝাটও ছিল; পত্তনিদার রামদেব নাগ অকারণে অত্যাচার করছিল তাঁর ওপর। রাজাকে 'নাগাষ্টক' নামে একটি ব্যঙ্গ কবিতা শুনিয়ে তার প্রতিকারের ব্যবস্থাও করে এসেছেন।

কিন্তু এবার রাজদর্শনের দিনগুলো খুব আনন্দে কাটেনি। কৃষ্ণনগর থমথম করছে, মহারাজার মুখে আষাঢ়ের ঘন মেঘ। আলীবর্দী মৃত। নওয়াজেস্

মহম্মদ আগেই দেহরক্ষা করেছেন, শওকৎ জঙ্গ যুদ্ধে নিহত, মীর্জা মামুদ নবাব সিরাজউদ্দৌলা হয়ে মুর্শিদাবাদের সিংহাসনে বসেছেন, তারপরেই কলকাতার ফিরিঙ্গিদের আক্রমণ করে তাদের দুর্গ কেড়ে নিয়েছেন। ফিরিঙ্গিরা প্রাণ নিয়ে পালিয়েছিল, কিন্তু আবার ফিরে এসেছে। এবার নবাবের সঙ্গে তাদের যুদ্ধ অনিবার্য। 'সাজ সাজ' রব উঠেছে।

জগৎ শেঠের চোখে ঘুম নেই। শওকৎ জঙ্গকে সমর্থন করেছিলেন বলে সিরাজ তাঁকে বন্দী করে কারাগারে পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু সেনাপতি মীরজাফর তাঁকে বন্দী রাখলে অস্ত্র ধরবেন না প্রতিজ্ঞা করায় বাধ্য হয়ে পূর্ণিয়ার যুদ্ধের সময় নবাব তাঁকে মুক্তি দিয়েছেন। কিন্তু একবার যখন সিরাজের মনে আগুন জ্বলেছে, তখন তাঁর হাত থেকে জগৎ শেঠের আর পরিত্রাণ নেই। এবং, জগৎ শেঠই যদি যান, তা হলে নবাবের বিরোধী একজন রাজা-জমিদারেরও আর নিষ্কৃতি নেই, স্রোতের মুখে কুটোর মতোই ভেসে যেতে হবে তাঁদের।

সুতরাং সিরাজকে সরাতে হবে। আজ দেখা যাচ্ছে, একমাত্র ফিরিঙ্গি ছাড়া এ কাজ আর কেউ করতে পারবে না। তারা নিজেরা দেশের রাজত্ব চালাক কিংবা মীরজাফরকে নবাব করুক, কোনো ক্ষতি বৃদ্ধি নেই, কিন্তু সিরাজউদ্দৌলাকে যেতেই হবে।

জগৎশেঠের বাড়িতে আলোচনা করে তা-ই ঠিক হয়েছে। সবাই একমত।

শুধু একজন সে বৈঠকে আসেননি, তিনি রানী ভবানী। এই সিরাজ-উদ্দৌলার জন্যেই তাঁর বিধবা কন্যার সম্মান বিপন্ন হয়ে উঠেছিল। অনেক কৌশলে সেবার নিজের এবং কন্যার মর্যাদা রক্ষা করেছিলেন তিনি। সিরাজকে তাঁর মার্জনা করবার কথা নয়। অথচ এই রানীই বলে পাঠিয়েছেন, 'দেশের রাজা যেমনই হোক, তবু সে দেশেরই রাজা। আজ তাকে উৎখাত করবার জন্যে ফিরিঙ্গিদের ডেকে আনলে তার পরিণাম শুভ হবে না। খাল কেটে কুমীর ঘরে তুললে অনেক বেশি সর্বনাশ হবে।'

স্ত্রী-বুদ্ধি চিরদিনই অন্যরকম, রাজনীতি বোঝে না। কিন্তু মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র জ্বলছেন অন্য কারণে। তিনিও এই ষড়যন্ত্রের শরিক বলে রানী ভবানী তাঁকে 'ভীরু কাপুরুষ' বলে ধিক্কার দিয়েছেন, 'স্ত্রী জাতিরও অধম' বলে তাঁর জন্যে শাড়ি-শাঁখা-সিঁদুর উপহার পাঠিয়ে দিয়েছেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র এখন ক্ষিপ্তের মতো রাতদিন দেওয়ানদের সঙ্গে সলা-পরামর্শ করছেন, ঘন ঘন মুর্শিদাবাদ থেকে খবর আসছে।

ওদিকে আর এক কাণ্ড বাধিয়েছিল রাজবল্লভ। তার বারো বছরের বিধবা মেয়ের দুঃখ সইতে না পেরে সে ঠিক করেছিল বিধবা-বিবাহ চালু করবে।

একদল পণ্ডিত মতও দিয়েছিল তার পক্ষে। শুনেই তেলে-বেগুনে জ্বলে গেছেন কৃষ্ণচন্দ্র। 'চার সমাজে'র মাথা তিনি—দেশের সব শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত তাঁর মাসোহারা পান—কৃষ্ণচন্দ্রের সভা থেকে বিধবা-বিবাহের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ উঠেছে, ভেস্তে গেছে রাজবল্লভের কুমতলব।

এইসব নানা ঝঞ্ঝাটে মহারাজের এখন আর মন-মেজাজের ঠিক নেই। দরবার থেকে সব খবরই পেয়েছেন ভারতচন্দ্র।

কৃষ্ণনগরের এই আবহাওয়ায় শুধু বেঁচে আছে 'বিদ্যাসুন্দর'। কণ্ঠাভরণ নীলমণি সমাদ্দার আসর জমিয়ে পালা গাইছেন—রসের বন্যায় রসিক শ্রোতারা মশগুল। হত্যা, যুদ্ধ, রক্ত, চক্রান্ত, বিদেশী বণিক—দেশ জুড়ে অরাজকতা বাড়ছে, চোর-ডাকাতের উৎপাত আরো বেশি করে শুরু হয়েছে, আবার দেখা দিয়েছে বর্গীর হাঙ্গামা—বাদরিয়ায় জাহাজের পর জাহাজ লুট করছে ফিরিঙ্গি-মগ-হার্মাদের দল। দেশ অন্ধকার, বিদ্যা বিকৃত, সুন্দরের মৃত্যু হয়েছে, বিদ্যা-সুন্দরের পালা ছাড়া আজ আর কী আছে?

ক্লান্ত, বিমর্ষ মন নিয়ে ভারতচন্দ্র চুপ করে শুয়েছিলেন। ফাল্গুনের সন্ধ্যা। হাওয়ায় আমের মুকুলের গন্ধ। বাইরে থেকে গঙ্গার কলধ্বনি আসছে। হঠাৎ মনে পড়ল, খানাকুল-কৃষ্ণনগরে এমনি এক সন্ধ্যাতেই দীঘির পাড়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন, তারপর হতভাগা রঘুনাথ—

নবজাতক দ্বিতীয় পুত্রটিকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে লীলা এসে স্বামীর পাশে বসলেন। প্রদীপের আলোয় কিছুক্ষণ উৎকণ্ঠিতভাবে চেয়ে রইলেন স্বামীর দিকে।

'কই, তোমার শরীর তো ভালো যাচ্ছে না। কৃষ্ণনগর থেকে ফিরে এসে তুমি যেন আরো শুকিয়ে গেছ।'

'আমি রাজবৈদ্য গোবিন্দরাম রায়কে দেখিয়েছিলুম।'

'কী বললেন তিনি?'

'বললেন, বহুমূত্র।'

লীলা চমকে উঠলেন: 'বলো কি গো, সে যে ভারী খারাপ অসুখ।'

ভারতচন্দ্র হাসলেন: 'ভয় নেই, সহজে মরব না। কবিরাজ ওষুধপত্র দিয়েছেন; বলেছেন, সাবধানে থাকতে হবে। যথাসম্ভব বিশ্রাম দরকার, মস্তিষ্কের ছুটি চাই—কাব্য রচনা কিছুদিন বন্ধ রাখলেই ভালো হয়।'

লীলা বললেন, 'আমি তোমার সব পুঁথি-পত্তর দোয়াত-কলম সিন্দুকে তুলে রাখব।'

আবার বিমর্ষভাবে হাসলেন ভারতচন্দ্র: 'সেই ভালো লীলা, সেই ভালো। কী হবে লিখে? কার জন্যে লিখব? আমি তো জানি, আমি কী লিখতে পারতুম—কী লিখে গেলুম! আমার খ্যাতি কিসে টিঁকে থাকবে জানো? ওই

বিদ্যাসুন্দরে। কেউ ওর আসল অর্থ বুঝবে না, কেউ বুঝবে না আমার যন্ত্রণা, শুধু তারিয়ে তারিয়ে পড়বে ওর রসিকতা, মজে থাকবে ওর ভোগবিলাসে, বলবে—সাবাস কবি, সাবাস কবিত্ব! লীলা, কিসের বিনিময়ে আমার এই যশ, এই সৌভাগ্য, এই অর্থ! আমি কী দিতে চেয়েছিলুম, আর কী দিলুম!'

এ নতুন কথা নয়। আজ পাঁচ বছর ধরে স্বামীর এই অন্তর-যন্ত্রণার ছবি দেখছেন লীলা, বার বার শুনেছেন কাতরোক্তি, দেখেছেন দীর্ঘশ্বাস। স্বামীর বুকে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন, 'সারাক্ষণ তোমার এই এক চিন্তা। এই সব ভেবে ভেবেই শরীরটাকে তুমি আরো খারাপ করে ফেলছ।'

ভারতচন্দ্রের আবার রহীমকে মনে পড়ল। আস্তে আস্তে বললেন :

'রহিমন কঠিন চিতান তে,
চিন্তা কো চিত চেত,
চিতা দহতি নির্জীব কো
চিন্তা জীবসমেত—'

লীলা চমকে উঠলেন।

'কী বলছ তুমি?'

'কিছু না।'

'তুমি আর এ-সব কথা ভাবতে পারবে না।'

'না লীলা, আর ভাবব না। ভাববার আর কিছু নেই।'

এই সময় দোরগোড়ায় দেখা দিল রঘুনাথ।

'কর্তা, আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে এক বোষ্টুমি।'

লীলা বলে, 'এত রাতে? বলে দে, কাল সকালে যেন আসে, কর্তার শরীর ভালো নেই।'

'আজ্ঞে বলছে, শুধু একটিবার প্রণাম করে যাবে। তা ছাড়া আজ ভোর-রাতেই চলে যাবে—হয়তো আর কখনো দেখা হবে না। আর কর্তাও তাকে চেনেন। মেয়েটা হল কেষ্টনগরের সেই কী বলে বিন্দে দূতী না—'

'চন্দ্রাবলী?'—ভারতচন্দ্র চঞ্চল হয়ে বিছানার ওপর উঠে বসলেন : 'সে কোত্থেকে এল? ডেকে আন্, ডেকে আন্ তাকে।'

'এখানে—এই ঘরে?'—রঘুনাথ একটু আশ্চর্য হল।

'হাঁ, এই ঘরে।'

লীলা চুপ করে রইলেন, ভালো-মন্দ কোনো মন্তব্য করলেন না। চন্দ্রাবলীর কথা স্বামী তাঁকে অনেকবার বলেছেন। এই মেয়েটিই ছিল নাকি তাঁর কাব্যের প্রেরণা। প্রেরণার অর্থ কী, লীলা বোঝেননি, বোঝবার চেষ্টাও করেননি। কখনো কখনো সন্দেহ আর ঈর্ষার দু-একটা ছোটখাটো কাঁটা বুকের ভেতরে মাথা তুলেছে, কিন্তু স্বামীকে তিনি জানেন—স্বামীকে তিনি বিশ্বাস করেন।

পরম ধর্মপ্রাণ চরিত্রবান ভারতচন্দ্র যে কোনো অন্যায় কখনো করতে পারেন না, এইটুকু বিশ্বাসই যথেষ্ট তাঁর পক্ষে।

রঘুনাথ আবার এসে দোরগোড়ায় দাঁড়ালো। তার পেছনে ছায়ার আড়াল থেকে আবার ভেসে এল, সেই বহুদিন, বহুবার শোনা কণ্ঠস্বরটি : 'ঠাকুরমশাই!'

'এসো চন্দ্রাবলী, এসো ভেতরে।'

প্রদীপের আলোয় চন্দ্রাবলী ঘরে পা দিল।

লীলা তাকালেন কৌতূহলে, দেখলেন অল্পবয়সী সুন্দরী একটি বৈষ্ণবী। পরনে গেরুয়া, চুড়ো করে বাঁধা চুল, কপালে তিলক-সেবা, আর হাতে একটি গোপীযন্ত্র। আর ভারতচন্দ্র আশ্চর্য হয়ে দেখলেন, যে মেয়েটি এলো চুলে গরদ পরে প্রায়ই তাঁকে পুজোর ফুল এনে দিত, তাকে আরো স্নিগ্ধ, আরো উজ্জ্বল বলে মনে হচ্ছে—হঠাৎ যেন চেনাই যায় না।

চন্দ্রাবলী বললে, 'ঠাকুর, প্রণাম। মা-জননী, প্রণাম।'

মাটিতে লুটিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল।

ভারতচন্দ্র কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন : 'এ বেশ কেন তোমার?'

'এই তো সত্যিকারের বেশ, ঠাকুর! ছিলুম কলকাতায় শেঠ আমীরচাঁদের আশ্রয়ে। তাঁর বাড়িতে যখন নবাবের ফৌজ ঢুকল, রক্তের বন্যা বয়ে গেল—সম্ভ্রম বাঁচানোর জন্যে পরিবারের মেয়েদের তলোয়ারের মুখে শেষ করা হল শেঠজীর হুকুমে—সেদিনই চোখের সামনে থেকে শেষ পর্দাটুকুও সরে গেল। দেখলুম, এই তো ভোগ, এই তো ঐশ্বর্য, এই তো জীবন। তবে আর এ-সব কেন? বেরিয়ে পড়েছি পথে। পেয়েছি বৈষ্ণবের সঙ্গ—যাচ্ছি শ্রীবৃন্দাবনে।'

ভারতচন্দ্র চুপ করে রইলেন। একদিন এমনি করে তিনিও বৃন্দাবনে চলেছিলেন। কিন্তু পথ তাঁর হারিয়ে গেল—জীবনে আর খুঁজে পেলেন না।

চন্দ্রাবলী বললে, 'যেতে যেতে মূলাযোড় পড়ল। ভাবলুম, আর এক ঠাকুরের ভেতরে আমার শ্রীকৃষ্ণকে দেখেছিলুম। তাঁকে প্রণাম না করে গেলে বৃন্দাবন যাত্রা আমার সার্থক হবে না। রঘুনাথের কাছে শুনেছি, তোমার শরীর ভালো নয়। তবু বিরক্ত করলুম একটিবারের জন্যে, একটিবার দেখে গেলুম, মন আমার পূর্ণ হল। অপরাধ নিয়ো না।'

আর একবার প্রণাম করে উঠে দাঁড়ালো।

'চলি, ঠাকুর। গৌর তোমাদের কল্যাণ করুন। আসি মা-ঠাকরুণ।'

রাত্রে ভালো ঘুম আসছে না। গায়ের মধ্যে একরাশ অস্বস্তিকর জ্বালা। ভারতচন্দ্র এ-পাশ ও-পাশ করছিলেন। খালি মনে পড়ছে, চন্দ্রাবলীও চলেছে বৃন্দাবনে। কেবল তাঁরই পথ হারিয়ে গেল। জীবনে কী চেয়েছিলেন, কী পেলেন তিনি!

স্বামীর ছটফটানিতে লীলার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠে বসলেন।

'কী, শরীর খারাপ লাগছে?'

'না, এমন কিছু নয়। বড্ড তেষ্টা পেয়েছে, একটু জল দাও।'

ঘরের কোণের সোরাই থেকে একটা রুপোর চুমকিতে করে জল এনে দিলেন লীলা। একটুখানি জল খেয়েছেন ভারতচন্দ্র, এমন সময় হঠাৎ চমকে উঠলেন তিনি, খানিকটা জল উপচে পড়ল বিছানায়।

বাইরে মেঘের ডাকের মতো ঘন ঘন গুরু গুরু রব। কিন্তু মেঘের ডাক নয়। বারুদের আওয়াজ। দূর থেকে আসছে, তবু মাটি পর্যন্ত কেঁপে উঠছে থর থর করে।

'ও কিসের আওয়াজ লীলা, কিসের আওয়াজ?'

লীলা বললেন, 'এ তো বিয়ের মাস। কোথাও বড়োলোকের বাড়িতে ঘটা করে বিয়ে হচ্ছে, বাজী পোড়াচ্ছে তারা। ও কিছু নয়, তুমি ঘুমোও।'

কিন্তু বাজী পুড়ছিল না। সিরাজউদ্দৌলার বন্ধু, ইংরেজের শত্রু—ফরাসীদের চন্দননগর ধ্বংস হয়ে যাচ্ছিল ক্লাইভের কামানে। চূর্ণ হচ্ছিল ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর কাছারীবাড়ী, ভেঙে পড়ছিল নন্দদুলাল মন্দিরের চূড়া। পলাশী যুদ্ধের বোধনমন্ত্র ছড়িয়ে পড়ছিল আমের মুকুলের গন্ধে, মাতাল বসন্তের হাওয়ায় হাওয়ায়।

—